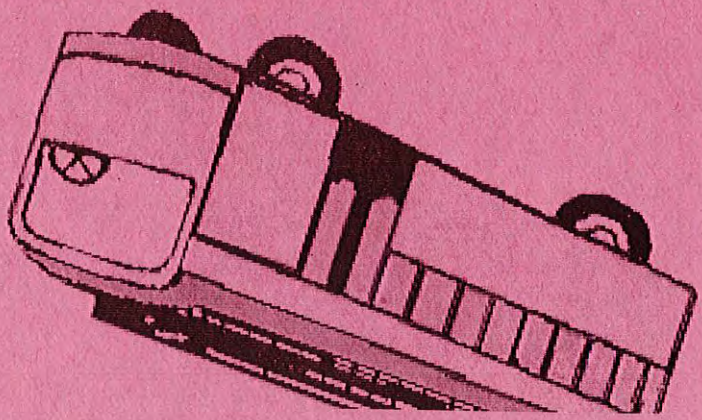
২০১। বাবার রক্ষক



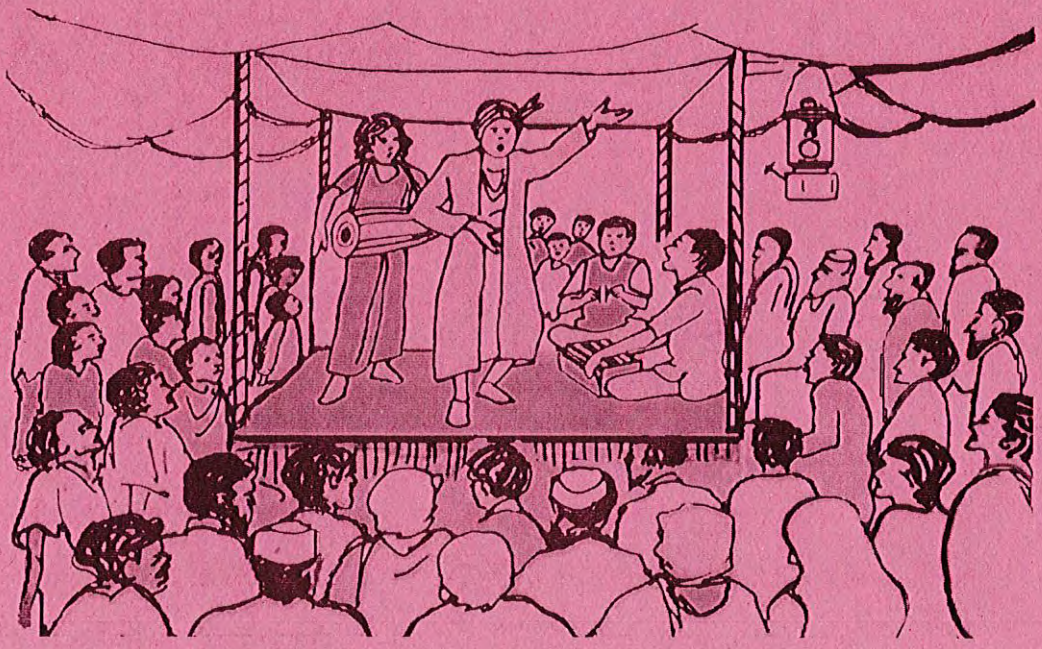
এক ছেলে ছিল। তাকে সবাই ভুলু বলে ডাকত, কারণ সে সব কথা ভুলে যেত। এক দিন তার বাবা বলল, কালকে শহরে বেড়াতে যাব। ভুলু বলল, বাবা, কালকে তুমি যেও না, বিপদে পড়বে। বাবা তার কথায় কান দিল না। সকালে যাবার জন্য তৈরি হল। কিন্তু জুতো পরতে গিয়ে খাটের তলে জুতো পেল না, তখন তাড়াহুড়া করে স্যান্ডেল খুঁজল, তাও পেল না। গাড়ী তাদের বাড়ির সামনে দিয়ে চলে গেল। সারা দিন আর কোন গাড়ী নেই। বাবা শহরে যেতে পারল না। রাগে দুঃখে সবাইকে বকা দিতে লাগল। বাড়িতে কি চোর বাসা বেঁধেছে? ঘরগুলো সব এলোমেলো, কিছু পাওয়া যায় না... আরও কত কি... তখন ভুলু একটা থলে এনে বলল, বাবা এই নাও তোমার জুতো, আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম। বলে সে পালিয়ে গেল। দুপুরে সবাই খেতে বসেছে,

এমন সময়ে ভুলু ফিরে এল। বলল, বাবা, সেই গাড়ী পাহাড়ী রাস্তা থেকে নিচে পড়ে গেছে। অনেক লোক মারা গেছে। মামাকে জিজ্ঞেস কর, শহর থেকে আসার সময় নিজের চোখে দেখেছে।



২০২। আব্বাসের যাত্রাদল

আব্বাস আমাদের দেশের একজন বিখ্যাত গায়ক। তার গান শুনে এখনও আমরা আনন্দ পাই। ছোট বেলায় সে স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে যাত্রা দেখাত। তাদের ঢাক-ঢোল ছিল না, কেরোসিনের টিন ব্যবহার করত। পাট দিয়ে দাড়ি-গোঁফ বানাত। বাঁশ দিয়ে তলোয়ার তৈরী করত। চাঁদর আর গামছা দিয়ে রাজা-মন্ত্রীর পোষাক বানাত । পাড়ার ছেলেমেয়েরা এই যাত্রা দেখে খুব আনন্দ পেত। বাবা-মায়েরাও দেখতে আসত। একদিন পাশের গ্রামে একটা উৎসব হল। রাত্রে একটা বিখ্যাত যাত্রাদল আসার কথা ছিল। কিন্তু নায়ক আসতে দেরী করছিল। লোকেরা বিরক্ত হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তারা আব্বাস! আব্বাস! বলে ডাকতে শুরু করল। আব্বাসের দল সেখানে বসে ছিল। দশ মিনিটের মধ্যে সব তৈরী হয়ে গেল। গান শুরু হল। দশটি গ্রামের মানুষ খুব আনন্দের সঙ্গে গান শুনতে লাগল। ছোটদের যাত্রা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেই বিখ্যাত নায়ক স্টেজে উঠতে পারল না।



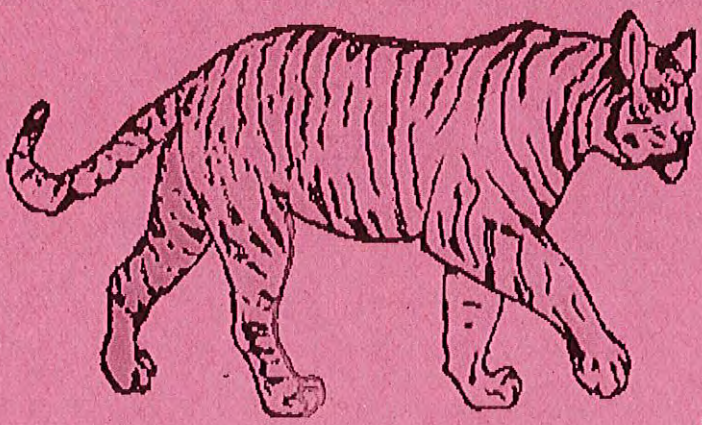
২০৩। রাখালের তামাসা



এক রাখাল ছিল। বনের ধারে সে গরু চরাত ও মনের সুখে বাঁশী বাজাত। সেখান থেকে কিছু দুরে কৃষকেরা মাঠে কাজ করত। একদিন রাখালের মাথায় এক বুদ্ধি এল। ভাবল, আজ একটু মজা করি। চিৎকার করে বলতে লাগল, বাঘ! বাঘ! বাঘ খেয়ে ফেলল! বাঁচাও! বাঁচাও!

কৃষকেরা সমস্ত কাজ ফেলে, লাঠি, দা, শেল, যে যা পেল তাই নিয়ে ছুটে এল। তারা এসে দেখে রাখাল হাসছে। কৃষকেরা রাগ করে চলে গেল। কয়েকদিন পরে রাখাল আবার সেই তামাশা করল। শেষে রাখালের চিৎকার শুনে আর কেউ আসত না। কিন্তু একদিন সত্যি সত্যি বাঘ এসে গেল। রাখাল প্রাণপণে চিৎকার করতে লাগল, বাঁচাও! বাঁচাও! কিন্তু কেউ এল না। সবাই ভাবল, তামাশা করছে।

বাঘটা সবচেয়ে সুন্দর গরুটা মেরে নিয়ে গেল। বড় ভাগ্যে রাখাল পালিয়ে প্রাণে বেঁচে গেল।

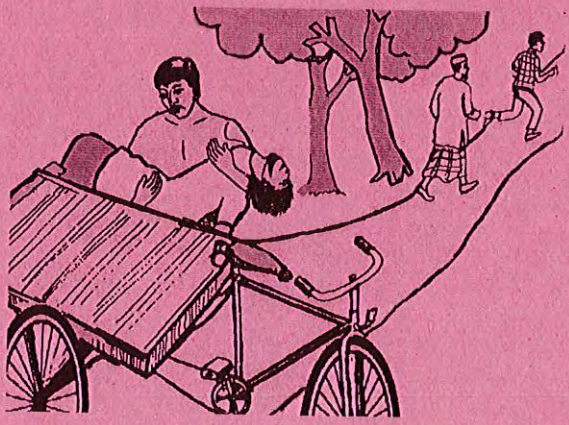




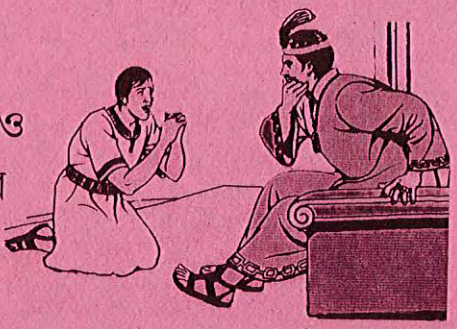
২০৪। কে আমার ভাই ?



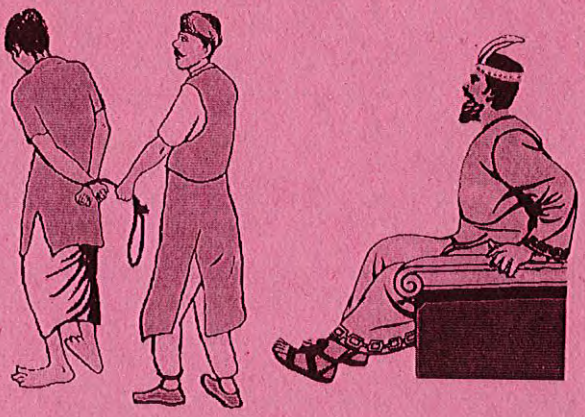
সকালে রহিম তার দুটো গরু বাজারে বেচতে গেল। ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। পথের মাঝে হঠাৎ দুজন ডাকাত সামনে দাড়িয়ে বলল, টাকা দাও নয় জান দাও! রহিম পালাতে যাচ্ছিল, কিন্তু পিছনে আর একজন ডাকাত ছিল। সে লাঠি দিয়ে মেরে রহিমের একটা পা ভেঙ্গে দিল। সবাই তাকে মেরে অজ্ঞান করে ফেলল ও টাকা নিয়ে পালিয়ে গেল। মেম্বার সাহেব সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। রহিমকে পড়ে থাকতে দেখে ছুটে পালাল। ভাবল, হয়তো ডাকাত এখনও আশেপাশে লুকিয়ে আছে। তার পিছনে আসছিল গ্রামের মোড়ল। সে দেখেও না দেখার ভান করে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল। এমন সময় আসল শিবু মেথর। সে রহিমকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখে, তার কোদাল বালতি ফেলে রেখে সদর রাস্তা থেকে একটা ভ্যান ডেকে তাড়াতারি রহিমকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। ডাক্তারকে বলল, এই পঞ্চাশ টাকা নেন, ওষুধের ব্যবস্থা করুন। আর যা লাগে আমি পরে এসে দিয়ে যাব। ডাক্তার রহিমের নাড়ী পরীক্ষা করে একটা ইনজেকশন দিল ও তার পা প্লাস্টার করে দিল। শিবুকে বলল, তুমি একে বাঁচালে। একটু পরে নিয়ে আসলে সে মারা যেত।



২০৫। নির্দয় চাকর



এক রাজা ছিল।তার বিরাট প্রাসাদও অসংখ্য চাকর-বাকর। প্রতিদিন প্রাসাদের লোকজনের খাওয়া-দাওয়ার জন্য অনেক টাকা খরচ হত। একদিন রাজা বাবুর্চির কেনা জিনিসপত্র ওজন করলো ও হিসাবের খাতা দেখল। পরের দিন নিজেই বাজার করতে গেল। তখন বুঝলো, বাবুর্চি প্রতিদিন অর্ধেক টাকা চুরি করে। তাকে ডেকে বলল, তোমার কাছে আমি দশ লাখ টাকা পাব। এখনই শোধ কর, না হলে তোমার সম্পদ বিক্রি করে আমার পাওনা আদায় করব। তিন দিন পর বাবুর্চি ফিরে এলো। তার জমিজমা বিক্রি করে পাঁচ লাখ টাকা এনে দিল। বলল, মহারাজ, আমি বাকী ঋণ আস্তে আস্তে শোধ করে দেব। রাজা তার বাকী ঋণ মাফ করে দিল।



বাবুর্চি প্রাসাদ থেকে বের হচ্ছিল, এমন সময় তার সামনে পড়ল আর এক চাকর। তার কাছে সে এক হাজার টাকা পেত। বলল, তোমার ঋণ শোধ কর, এক্ষুনি! লোকটি তার পা ধরে বলল, এই মাসের শেষে মাইনা পেয়ে শোধ করে দেব। বাবুর্চি কিছু শুনল না, লোকটির গাভী বিক্রি করে ঋণটা আদায় করে নিল। এই খবর রাজার কানে গেল। তখন রাজা তাকে ডেকে প্রহরীদের বলল, এই লোকটার সবকিছু বিক্রি করে আমার টাকা আদায় কর, আর বাকী ঋন শোধ না করা পর্যন্ত সে আমার যাঁতাকল ঘুরাতে থাকবে।

২০৬। বিপদের বন্ধু

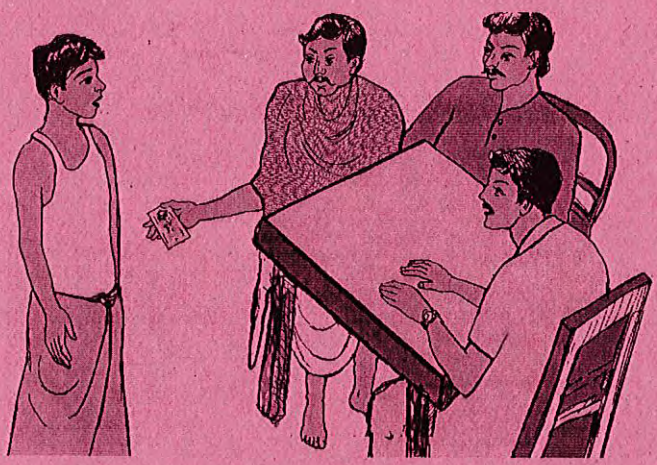
দুজন বন্ধু ছিল। তারা একসঙ্গে খেলত, একসঙ্গে পড়ত, একসঙ্গে বেড়াত। একজনের নাম ভুলু, আর একজনের নাম কালু। কালু গাছে উঠতে পারত, ভুলু পারত না, তাই ভুলুর জন্য কালু ডাব পেরে নিত। ভুলুর কাঁঠাল গাছ ছিল, কালুর ছিল না, তাই ভুলুর বাড়িতে কাঁঠাল খেত। একদিন তারা বনে-জঙ্গলে বেড়াতে গেল। হঠাৎ দেখতে পেল একটা কালো ভাল্লুক তাদের দিকে দৌড়ে আসছে। তাদের দুজনের হাতে দা ছিল কিন্তু কালু এত ভয় পেল যে, দা ফেলে দিয়ে একটা গর্জন গাছের চুঁড়ায় উঠে গেল। কিন্তু ভুলু গাছে উঠতে পারেনি, সে



গাছের তলে মরার মত শুয়ে পড়ল। ভাল্লুক কাছে এসে বার বার তার হাত, পা, কান, চোখ, পিঠ, চুল, মুখ শুকতে লাগল। ভুলু ভয়ে কাঠের মত শক্ত হয়ে গেছে। ভাল্লুক মনে করল এই লোকটি দুই দিনের মরা। ভাল্লুক মরা জিনিস খায় না। তাই ভুলুর পাশ কাটিয়ে অন্য জায়গায় চলে গেল। এদিকে কালু গর্জন গাছের চুঁড়ায় চুপ করে রইল, ভাল্লুক যেন টের না পায়। বন্ধুর জন্য সে কিছুই করল না। আধ ঘন্টা পর কালু আস্তে আস্তে গাছ থেকে নামল, ভুলুও উঠে দাঁড়াল। দুজনই দ্রুত বেগে সেখান থেকে পালাতে লাগল। জঙ্গলের বাইরে এসে ক্লান্ত হয়ে খোলা মাঠে বসে পড়ল। তখন কালু হাসতে হাসতে ভুলুকে জিজ্ঞাসা করল, ভাল্লুক তোমার কানে কানে কি বলে গেল? ভুলু উত্তর দিল, ভাল্লুক আমাকে বলে গেল, তোমার মত ভীরু ছেলের সাথে বন্ধুত্ব করে লাভ নেই।

২০৭। তোমাদের টাকা ফিরিয়ে নাও!

একটা জাহাজ ভারত থেকে এসে চট্টগ্রামে ভিড়ল। খুব বড় জাহাজ। তাতে ট্রাক, ট্যাক্সি, মোটরসাইকেল বোঝাই। গত তিন বছর ধরে সেলিম এই জাহাজে কাজ করছে। দুই মাস পর পর চট্টগ্রামে ফিরে আসে। তিন দিন বাড়ি থাকে, এক হাজার টাকা বাবা-মার হাতে দিয়ে আবার চলে যায়। তার কাজ হল পুরোটা জাহাজ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। সারা দিনের পরিশ্রমে সে এত ক্লান্ত হয়ে পড়ে যে, শরীরটা কোন রকম টানতে টানতে বিছানায় এসে ঘুমিয়ে পড়ে। ব্যবসায়ীরা জিজ্ঞেস করে তার মাইনা কত।

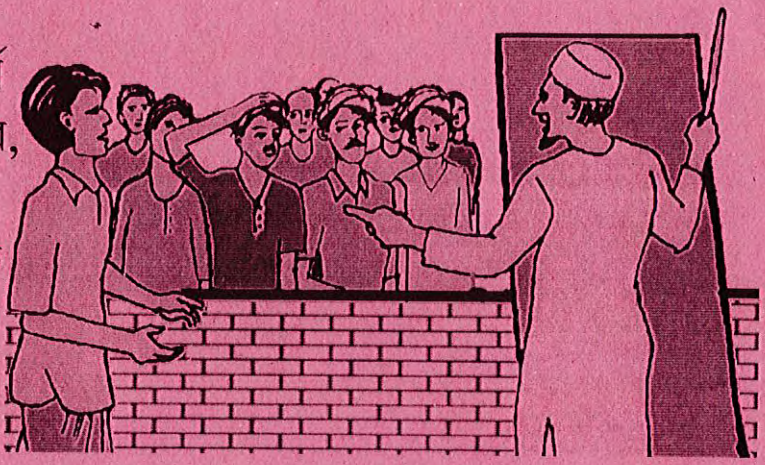


শুনে তারা হাসে, তার পরিশ্রম দেখে ওদের মায়া হয়। একদিন চাঁদা তুলে ওকে দু'হাজার টাকা দান করল। সেলিম ভাবল, বাবা-মা খুব খুশি হবে। টাকাগুলো দিয়ে ব্যবসায়ীরা বলাবলি করতে লাগল, এই ছেলে বাঙ্গালী বলে মনে হয় না। বাঙ্গালীরা জন্মের অলস, পরিশ্রমকে তারা ভূতের মত ভয় করে। সেলিম পাশের ঘর থেকে তাদের প্রত্যেকটি কথা শুনছিল। শুনে, সেই দু'হাজার টাকা তার গায়ে যেন কাঁটার মত লাগছিল। হঠাৎ সে ঘরে ফিরে এসে টাকাগুলো তাদের সামনে ছুড়ে মারল। বলল, তোমাদের উপকার আমি চাই না।



২০৮। কাজীর বিচার

এক দোকানদার কাজী সাহেবের কাছে নালিশ করতে গেল। তার দোকানের মাল চুরি হয়ে গেছে। কি কি মাল চুরি হয়েছে তা সে বলে দিল। কাজী সাহেব অনেক্ষন চিন্তা করল, শেষে বলল, এই চুরির কোন সাক্ষী আছে?



দোকানদার আশ্চর্য হয়ে বলল, না হুজুর, সাক্ষী নেই।

• কেন? চোর কি দরজা দিয়ে পালায়নি? দরজাটা খুলে নিয়ে এসো।

দোকানদার বাজারের মধ্যে দিয়ে দরজাটা কাজীর কাছে নিয়ে আসল। কাজী সাহেব দরজার গায়ে কান লাগিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কে মাল চুরি করেছে, বল?... সে কি! উত্তর দিচ্ছ না কেন?... দাড়াও, আমি তোমার মুখ খুলে দিচ্ছি। কাজী সাহেব একটা মোটা বেত নিয়ে দরজার গায়ে মারতে লাগল। আবার জিজ্ঞাসা করল, আবার মারল। এই কান্ড দেখে বাজারের সব লোক এসে ভীড় করতে লাগল। বলতে লাগল, কাজী সাহেব পাগল হয়ে গেছে। এবার কাজী সাহেব আবার কান লাগিয়ে বলল, দরজাটা চোরের নাম জানেনা, এইটুকু জানে যে, চোরের পাগড়ীতে এখনও মাকড়সার জাল জড়ানো আছে। সঙ্গে সঙ্গে ভীড়ের মাঝে একজন পাগড়ীতে হাত দিল। কাজী সাহেব দোকানদারকে বলল, যাও, ওর বাড়ীতে খুঁজে দেখ। চুরি করা মাল পাওয়া যাবে।

২০৯। অতিথি সেবা

মহানবী একদিন নিজের ঘরে বসে আছেন, এমন সময় এক পথিক তার কাছে এল। বলল, দয়া করে আমাকে এক গ্লাস পানি দাও। মহানবী তাকে স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর স্ত্রী বললেন, আমি দুঃখিত, ঘরে পানি ছাড়া আর কিছু নেই। সেই সময় মহানবীর কাছে তাল্লা নামে এক লোক বসে ছিল। সে বলল, হুজুর, আমি আপনার অতিথিকে খেতে দেব, আপনি ভাববেন না। মহানবী খুশী হয়ে তাকে দোয়া করলেন।



অতিথিকে নিয়ে তাল্লা বাড়ি গেল। বিবিকে বলল, লোকটি দু'দিন খায়নি। ঘরে কি আছে দেখ তো। তার স্ত্রী বলল,

– নিয়ম অনুসারে আপনাকে অতিথির সঙ্গে খেতে হবে। কিন্তু দু'জনের জন্য খাবার নেই। আপনি কি খাওয়ার ভান করতে পারবেন ?

– তাল্লা বলল, তুমি আমার সম্মান বাঁচালে। তোমার মত বুদ্ধিমতী বিবি আর নেই। তাল্লা অতিথির সঙ্গে খেতে বসল। তার স্ত্রী অতিথির জন্য খাবার এনে বলল, তেল ফুরিয়ে গেল। বলে, বাতি নিভিয়ে দিল। অন্ধকারে তাল্লা খাওয়ার ভান করতে লাগল। অতিথি পেট ভরে খেয়ে শুতে গেল। পরদিন মহানবী ব্যাপারটা শুনে বললেন, আল্লাহ যেন তোমাদের এই বুদ্ধি জীবন ভরে টিকিয়ে রাখেন।



২১০। সোনার কুড়াল



এক কাঠুরে নদীর ধারে কাঠ কাটছিল। কাটতে কাটতে হঠাৎ তার কুড়াল গভীর পানিতে পড়ে গেল। বেচারা নদীর তীরে বসে কাঁদতে শুরু করল। তার করুণ কান্না শুনে নদীর দৈত্য এসে জিজ্ঞেস করল, কাঁদছো কেন ? কাঠুরে সব খুলে বলল। দৈত্য নদীতে ডুব দিল। ফিরে এল একটা সোনার কুড়াল নিয়ে। জিজ্ঞাসা করল, এটা কি তোমার কুড়াল? কাঠুরে বলল, জি না, ওটা আমার নয়। দৈত্য আবার ডুব দিয়ে উঠে আসল একটা রূপার কুড়াল নিয়ে। বলল, এটা কি তোমার কুড়াল ? কাঠুরে বলল, জি না, ওটাও আমার নয়। শেষে দৈত্য একটা লোহার কুড়াল নিয়ে আসল। কাঠুরে বলল, এটা আমার। দৈত্য বলল, বেশ, তিনটাই নিয়ে যাও। আমার দরকার হয় না।

কাঠুরে সবাইকে তার কাহিনীটা বলল। পরের দিন এক লোভী মানুষ নদীতে গিয়ে তার কুড়াল ফেলে দিল ও কাঁদতে শুরু করল। দৈত্য এসে জিজ্ঞেস করল, কাঁদছো কেন ?

– আমার কুড়াল নদীতে পড়ে গেছে।

দৈত্য নদীতে ডুব দিয়ে ফিরে এল একটা সোনার কুড়াল নিয়ে।

লোকটি বলল, ওটা আমার নয়। দৈত্য রূপার কুড়াল এনে দিল।

লোকটি বলল,ওটাও আমার নয়।

তখন দৈত্য মুচকি হেসে বলল, দেখলে তো ভাই, আমি চেষ্টা করেছি, তোমার কুড়াল পাওয়া যাচ্ছে না। এই বলে সে ডুব দিল আর ফিরল না।

২১১। তোমার ছেলে মানুষ হয়েছে



এক জমিদার ছিল। তার অনেক জমিজমা। জমিদার ভাল মানুষ। যারা তার জমি চাষ করত, তারা সবাই খেয়ে-পরে বাঁচতে পারত। কিন্তু এক বছর বৃষ্টি হল না। ক্ষেতের অর্ধেক ফসল নষ্ট হয়ে গেল। প্রায় লোকেরা না খেয়ে থাকত। জমিদার ভাবল, কিছু একটা করতে হবে।

বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখল, কারা না খেয়ে রয়েছে। ফিরে এসে তার চাকরকে একটা কাগজ দিয়ে বলল, এই ক'জন বাচ্চাকে আমার কাছে আসতে বল। বাচ্চারা প্রতিদিন এসে একটা করে বড় রুটি পেত। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েরা রুটির দিকে দৌড়াত। সবাই কাড়াকাড়ি করত সবচেয়ে বড় রুটি পাওয়ার জন্য। কেবল একটা ছেলে দৌড়াত না, এমন কি, সে রুটি খেয়ে ফেলত না, বাড়ি নিয়ে যেত। জমিদার তাকে জিজ্ঞাসা করল, রুটিটা খাও না কেন? সে বলল, আমার তিনটে ভাইবোন আছে।



– কেন তুমি অন্যদের মত দৌড়াও না?

– হয়তো ওদের বেশী খিদে লাগে।

ছেলেটা প্রত্যেক দিন সবচেয়ে ছোট রুটি নিয়ে বাড়ি ফিরত। একদিন ছেলেটার বাবা জমিদারের কাছে এল। বলল, সাহেব, এই নেন, রুটির ভিতরে দশটি সোনার মুদ্রা ছিল। জমিদার বলল, এই টাকা তোমার ছেলের জন্য। তোমার ছেলে মানুষ হয়েছে। এমন ছেলে না খেয়ে মরবে, আমি তা চাই না।

২১২। ক্লাস ওয়ানের প্রতিযোগিতা

প্রাইমারী স্কুলে আজ খেলার দিন। ক্লাস ওয়ানের ছেলেমেয়েরা এক মাস আগে পাঁচজন ছেলে ও পাঁচজন মেয়েকে বেছে নিয়েছে পঞ্চাশ মিটার দৌড়াবার জন্য। সারা মাস তারা আরও চালু হবার জন্য স্কুলের মাঠে দৌড়াদৌড়ি করেছে, এমন কি তারা একসঙ্গে দৌড়াতে দৌড়াতে স্কুলে এসেছে ও বাড়ি ফিরে গিয়েছে। আজ তারা দৌড়াবে। তাদের একজন পুরস্কার পাবে কিন্তু গ্রামের সবাই দেখতে পাবে ক্লাস ওয়ানের ছেলেমেয়েরা কেমন দৌড়াতে পারে।

সময় মত দশজনই সামনে এসে সাদা লাইনের উপরে পা দিল। স্যার বাঁশী বাজাল। সঙ্গে সঙ্গে সবাই দ্রুত বেগে দৌড়াতে শুরু করল। কিন্তু তারা বিশ হাত দুরে যায়নি, এমন সময় সবচেয়ে ছোট ছেলেটি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। কপালে ব্যথা পেয়ে কাঁদতে লাগল। সবাই পিছনের দিকে তাকাল। সারা মাস একই দলে পরিশ্রম করে তাদের মধ্যে খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। তাই ওর অবস্থা দেখে একজন একজন করে সবাই থেমে গেল ও সাহায্য করার জন্য পিছনে ফিরে এল। সবাই মিলে তাকে উঠাল, তার জামা প্যান্ট ঝেড়ে দিল, একটি মেয়ে ওড়না দিয়ে তার চোখের পানি মুছে দিল, তারপরে তাকে মাঝখানে রেখে সবাই পরস্পরের হাত ধরে একসঙ্গে মাঠের শেষ পর্যন্ত দৌড়াল।





মাঠের চারিদিকে সারা গ্রামের লোকেরা দাঁড়িয়ে খেলা দেখছিল। এই দৃশ্যটা দেখে তারা ভাবল, আমাদের বাচ্চারা মানুষ হয়েছে। তারা হাততালি দিয়ে আকাশ ফাটিয়ে দিল।

২১৩। ঋণ শোধ

আলী টিফিনের সময় বাদাম ভাজা খাচ্ছিল। মানিক বলল, আমাকে একটা দেবে? আলী বলল, আর নেই । যদি বাদাম খেতে চাও, তুমিও আমার মত আয় কর। কালকে মা আমাকে উঠান সাফ করতে বলল, শেষে আমাকে একটা টাকা দিল, সেই টাকা দিয়ে আমি বাদাম কিনে খেয়েছি। মানিক বাড়ি গিয়ে হিসাব করতে বসল। শেষে কাগজটা



মায়ের কাছে নিয়ে গেল। মা পড়তে লাগল। আমার পাওনাঃ- আমি আটা, চাল, ডাল বাজার থেকে এনেছি তার জন্য ৫০ পয়সা। এক ঘন্টা ছোট বোনের দেখাশোনা করেছি ১ টাকা। উঠান সাফ করেছি ১ টাকা। স্কুলে ভাল নম্বর পেয়েছি ১ টাকা। আমার জামা-কাপড় ধুয়েছি ১ টাকা। মোট পাওনা চার টাকা ৫০ পয়সা। মা কাগজটা পড়ে কিছুক্ষন চুপ করে রইল। তারপরে হঠাৎ মৃদু হেসে পাতাটা উল্টিয়ে লিখতে লাগলঃ- আমার পাওনাঃ-দশমাস তোমাকে পেটে ধরেছি, তার জন্য কিছু না। যত দিন তোমার যত্ন করে কাটিয়েছি, তার জন্য কিছু না। প্রতিদিন তোমার জন্য রান্না করেছি, তার জন্য কিছু না। তোমার অসুখের সময় যত রাত আমার ঘুম হয়নি, তার জন্য কিছু না। তোমার দুষ্টুমির জন্য এই নয় বছর ধরে যা চোখের জল ফেলেছি, তার জন্য কিছু না। মোট, শুন্য। মানিক হঠাৎ মাকে জড়িয়ে ধরল। নিজের হিসাবের নিচে লিখলঃ- সব শোধ!। মানিক।



২১৪। সৎ মানুষের মাঝে দস্যু

এক রাজা ছিল। সবাই তাকে ভালবাসত। সবাই বলত, ওর মত জ্ঞানী ও সৎ রাজা কোন দেশে নেই। একদিন রাজা তার প্রজাদের সঙ্গে দেখা করতে গেল। ধনী-গরীব সবার সঙ্গে দেখা করল। শেষে কারাগারে এসে পৌঁছল। একজন একজন করে সকলকে জিজ্ঞেস করল,

- তোমাকে জেল খাটানো হচ্ছে কেন? বন্দীরা উত্তর দিতে লাগলঃ-

- মহারাজ, আমি কিছু করিনি। এক শত্রু আমার নামে মিথ্যা মামলা করে, মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে, আমাকে জেলে দিয়েছে।

- মহারাজ, আমি কিছু করিনি। আমার এক শত্রু খাটের তলে একটা রামদা লুকিয়ে রেখেছিল, পুলিশ আমাকে ডাকাত বলে জেলে দিয়েছে।

- মহারাজ, আমি কিছু করিনি। সন্ধ্যার সময় বাড়ি আসছিলাম, পথে একটা দড়ি ছিল। দড়িটা নিয়ে বাড়ি যাই, হঠাৎ লোকেরা এসে আমাকে মারধোর করতে লাগল। দড়ির মাথায় একটা কালো গরু বাঁধা ছিল, আমি তা লক্ষ করিনি মহারাজ, আল্লার কসম।

একজন বন্দী নিজেকে লুকাচ্ছিল। রাজা বলল,



- তুমি কেন জেল খাটছ ?

- লোকটি সত্য কথা বলল। জামাই আমার মেয়েকে মারধোর করেছিল, তাই আমি ওর গলা কেটে ফেলেছি, মহারাজ...

লোকটির চোখে পানি। জেলখানার পরিচালক রাজার পাশে ছিল। রাজা মুচকি হেসে বলল, এই জেলখানার মধ্যে সবাই সৎ মানুষ। এই দস্যুকে ঢুকতে দিলে কেন? ওর সাথে মিশে সবাই নষ্ট হয়ে যাবে। একে বাড়ি পাঠিয়ে দাও!

২১৫। বাবার দাম আছে!

একদিন আমি বাবার সঙ্গে মেলা দেখতে যাই। আমার আনন্দের সীমা নেই। সেই সময় তিন ছেলেমেয়ে ও তাদের বাবা-মা আমাদের সামনে হাটতে লাগল। ছেলেমেয়েদের কথা আমার কানে আসছিল। তারাও মেলা দেখতে যাচ্ছিল। এর আগে কোন দিন যায়নি, তারা আনন্দে লাফালাফি করছিল। আমরা একসঙ্গে টিকিট-কাউন্টারের সামনে পৌঁছে গেলাম। ওদের বাবা পঞ্চাশ টাকার একটা নোট বের করে বলল, আমরা পাঁচজন। কেরানী বলল, আরও বিশ টাকা লাগবে। লোকটি ডান পাশের পকেটে হাত দিল। তারপরে বাম পাশের পকেটে হাত দিল। আবার ডান পাশে হাত দিল...। হঠাৎ দেখলাম আমার বাবা মাটিতে কি যেন খুঁজছে। যখন দাঁড়াল, তখন তার হাতে ছিল বিশ টাকার একটা নোট। বলল, ভাই, আপনার টাকা পড়ে গেছে।

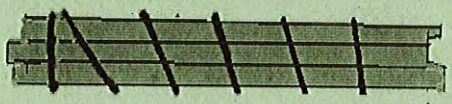


আমি লোকটার চোখ-মুখ দেখে বুঝলাম, তার টাকা পড়েনি। সে জানে, তার মাত্র পঞ্চাশ টাকা আছে। আমি বুঝতে পারলাম, আসলে বাবা টাকা খুঁজে পায়নি, সে নিজের টাকা দিচ্ছে। তখন মনে মনে ভাবলাম, আমার বাবার দাম আছে কিন্তু! আমরা গরীব হলে কি হবে! আমরা দিতে জানি।

২১৬। একতাই বল



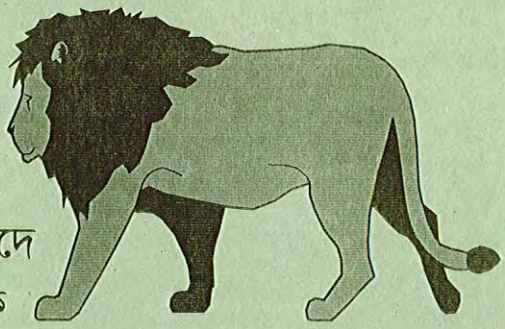
এক চাষী ছিল, তার অল্প জমি-জমা ও তার পাঁচটি ছেলে। পাঁচটি ছেলের মধ্যে কোন মিল ছিল না। একদিন বড় ছেলে বাবাকে বলল, আমার ভাগের জমি আমাকে দাও। আমি একা চাষ করব, একা ফল পাব। মেঝ ছেলে একই কথা বলল, আর বাকি তিনজনও তাই বলল। বাবা বলল, বেশ, আমি জমিটা ভাগ করে দিচ্ছি, কিন্তু এর আগে তোমাদের একটা কৌশল শিখিয়ে দেব। এই কৌশলটা



জানলে তোমাদের জমির ফসল দ্বিগুণ হবে। বাবা পাঁচটি শক্ত লাঠি নিয়ে আসল, তারপর একটা দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধল। শেষে ছেলেদের ডাকল। ছোটজনকে বলল, এই পাঁচটি লাঠি ভাঙতে পার কি না দেখ। ছেলেটা অনেক চেষ্টা করেও ভাঙতে পারল না। বাবা প্রত্যেক ছেলেকে লাঠিগুলো দিল। কেউ ভাঙতে পারল না। তখন বাবা দড়িটা খুলে একটা করে লাঠি প্রত্যেক ছেলের হাতে দিয়ে বলল, এবার চেষ্টা কর। ছেলেরা খুব সহজে লাঠিগুলো ভেঙ্গে ফেলল। তখন বাবা বলল, তোমরা এক হয়ে থাকলে, একজন অভাবে পড়লে আর একজন তাকে বাঁচাবে। কিন্তু পৃথক হয়ে গেলে সবাই দুর্বল হয়ে যাবে ও না খেয়ে থাকবে... এবার তোমরা আমাকে যা করতে বল আমি তাই করব। তারা সারা সপ্তা ভাবতে লাগল। এক সপ্তা পরে এসে বলল, আমরা সবাই মিলে জমি চাষ করব, যা পাব তা সবাই মিলে খেয়ে বাঁচব। আর যদি কিছু থাকে, তা জমা রাখব। যদি কেউ বিপদে পড়ে তাতে রক্ষা পাবে।

২১৭। সিংহ ও ইঁদুর





একটি ইঁদুর ছিল, তার চারটি বাচচা। একদিন খাবার খুঁজতে গিয়ে বিপদে পড়ল। ইঁদুর যে পথ দিয়ে যাচিছল ঠিক সে পথ দিয়ে সিংহ আসছিল। ইঁদুর এত ভয় পেল যে এক পাশে দাড়িয়ে কাঁপতে লাগল। সিংহ গর্জন করে বলল, আমি তোমার সামনে দিয়ে যাচিছ, তুমি আমাকে সালাম করলে না কেন? ইঁদুর বলল, মহারাজ আপনাকে দেখে এত ভয় পেলাম যে, সালাম করতেও ভুলে গেছি। সিংহ বলল, তোমার শাস্তি হল মৃত্যুদন্ড, আমি তোমাকে খেয়ে ফেলব। ইঁদুর কেঁদে কেঁদে বলল, মহারাজ আমার চারটি বাচচাও না খেয়ে মরবে। আমাকে ক্ষমা করে দেন, আমি সারা জীবন আপনার দয়ার কথা বলব। সিংহ বলল, তাতে আমার কি লাভ? যাও, তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম, তবে কোন দিন বলবে না যে, তোমার দ্বারা আমার কোন উপকার হল।

ইঁদুর কাঁপতে কাঁপতে চলে গেল। কিছুদিন পরে সিংহ শিকার করতে গিয়ে , হঠাৎ এক গাছের তলে যাওয়ার সময় একটা জাল তার উপরে পড়ল। সে জাল থেকে বের হবার জন্য যত চেষ্ঠা করে, জাল তত বেশি আটকে যায় । রাগে সিংহ গর্জন করতে লাগল। বনের পশুরা তার গর্জন শুনল, কেউ সাহায্য করতে এল না। কিন্তু ইঁদুর তার চারটি বাচচা নিয়ে দৌড়ে এল ও জাল কাটতে শুরু করল। পাঁচ মিনিট পর সিংহ জাল থেকে বেরিয়ে এল। বলল, আমি সেদিন ভুল করেছি। এখন বুঝলাম, ছোটরাও বড়দের উপকার করতে পারে।

২১৮। দু'টি বোন

পারভীন ও স্বর্ণা দুটি বোন । স্বর্ণার বয়স এগার বছর পারভীনের বয়স দশ। দুজনেই দেখতে সুন্দরী, কিন্তু পারভীন চঞ্চল ও হাসিমুখি, স্বর্ণা চিন্তাশীল ও গম্ভীর, তাই লোকেরা তার দিকে চেয়েও দেখে না, এদিকে সে খুব লেখাপড়া করে, স্কুলে প্রতি বছর ফার্স্ট হয়, বড় হলে ডাক্তারী করবে। পারভীন কিন্তু ছোটদের সঙ্গে খেলা করে ও চকলেট খায়, বড়দের সঙ্গে ফুটবল খেলে, মারামারি করে, সবাই তাকে ভালবাসে। একদিন বাবা দুই বোনকে দুটো মাটির ব্যাংক কিনে দেয় টাকা রাখার জন্য। ব্যাংক ভর্তি হলে তারা নতুন কাপড় কিনবে, পুতির মালা কিনবে, পিকনিকে যাবে, ও ফুর্তি করে বেড়াবে, সকলে তাদের সালাম করবে...। তিন মাস গেল। পারভীন কিন্তু আগের মত চকলেট কিনে খায়, ছোট বড়দের সঙ্গে হাসি তামাসা করে বেড়ায়। স্বর্ণার ব্যাংক এরই মধ্যে ভারি হয়ে গেল, ঝাঁকা দিলে অনেক শব্দ হয়। সে পারভীনকে বলে, এবার চল, আমাদের টাকা নিয়ে ফুর্তি করে বেড়াব, তোমার টাকা কই? পারভীন তার ব্যাংক উল্টিয়ে দেয়...। সে কি! ব্যাংকের তলা নেই, ভিতরে এক টাকাও নেই। স্বর্ণা চোখ মোটা করে তাকায়। পারভীন হেসে কুটি কুটি। বলে, আপা আমি একশ দিন ধরে আনন্দ করে এলাম, তুমি একশ দিন নষ্ট করেছ, আর ফিরে পাবে না!





২১৯। আল্লার সঙ্গে সাক্ষাৎ

এক ভদ্র লোক ছিল। সে এত ধর্মশীল যে, এক বার নামায পড়তে না পারলে সারা সপ্তা তার ঘুম হত না। সে মনে মনে ভাবত, আমি আল্লার এত ভক্ত মানুষ, কেন তিনি এক বারও দেখা করেন না?

রাত্রে সে একটা স্বপ্ন দেখল। সাদা মেঘের উপর থেকে আল্লা তার নাম ধরে ডাকছিলেন, আলম, তুমি আমাকে এত ভক্তি কর, আমি তোমার বাড়িতে এক বার আসব। আলমের মনে আনন্দ ধরে না। খুব ভোরে উঠে তার স্ত্রী ও তার চাকরকে জাগিয়ে সারা বাড়িটা পরিষ্কার করতে শুরু করল। সেদিন শুক্রুবার। সকাল থেকে পাশের বাড়ির ছেলেমেয়েরা তার ছেলের সঙ্গে খেলতে এল, সে ধমক দিয়ে তাদের তাড়িয়ে দিল। দুপুরে এক বুড়ি ভিক্ষা করতে এল, সে চাকরকে বলল, ওকে চলে





যেতে বল। কাজ শেষ করতে বেলা হয়ে গেল। আলম সাহেব বারান্দায় দুটি চেয়ার এনে আল্লার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। দুপুর পেরিয়ে গেল, কেউ এল না, সুর্য নেমে গেল, কেউ এল না। আলম সাহেব ভাবল, আল্লাহ তার কথা ভুলে গেছেন। নামাযের সময় পশ্চিমে আকাশ লাল হয়ে গেল। সেখান থেকে আলম সাহেব একটা কণ্ঠ শুনতে পেল, আলম, আজ আমি তোমার বাড়িতে এসেছি, তুমি আমাকে ঢুকতে দিলে না। আলম অবাকঃ- সে কি! আপনি এসেছেন... কখন? আল্লাহ উত্তর দিলেন, সকালে যে শিশুদের তাড়িয়ে দিলে আমি তাদের মধ্যেই ছিলাম। দুপুরে যে ভিক্ষুককে তাড়িয়ে দিলে... আমি তার মধ্যেই ছিলাম।

২২০। নিন্দার পরিনাম

এক রানীর এক দাসী ছিল। দাসীর স্বভাব খুব ভাল ও তার সমস্ত কাজ নিখুত। রানী তাকে খুব ভালবাসত, শুধু এইটুকু তার দুঃখ ছিল যে, সময় সময় মেয়েটি সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে লোকের দুর্নাম ছড়াত।

এক দিন রানী দাসীকে ডেকে বলল, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। আজ বাজারে গিয়ে একটা মুরগী কিনবে, তার গলা মটকাবে, তারপর পথ চলতে চলতে সমস্ত পালক তুলে নেবে। এখানে পৌছাবার আগে যেন মুরগীটা পরিষ্কার হয়ে যায়।



দাসী তার অভ্যাস মত রানীর হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালন করল।

পরের দিন রানী বলল, কই? সেই মুরগীর পালক নিয়ে এস। মেয়েটা ভয়ে কাঠ হয়ে রইল। বলল, পথে ফেলে এলাম। রানী বলল, সে কি! মুরগীটার সমস্ত পালক কুড়িয়ে নিয়ে এস!। দাসী চোখ মোটা করে রানীর দিকে তাকাল... রানী বলল, এখনই যাও, পালকগুলো এই থলিতে করে নিয়ে এস। মেয়েটা গেল। তিন ঘন্টা পরে ফিরে এল দুটি পালক নিয়ে। রানী খুব রাগ করল। আবার পাঠিয়ে দিল। মেয়েটা রাত্রে কেঁদে কেঁদে ফিরে এল সেই দুটি পালক নিয়ে। এবার রানী বলল, তিন দিন আগে তুমি তোমার বান্ধবীকে বললে যে, আমাদের বাবুর্চির চোখ টেরা। সে কথা সত্য হোক আর মিথ্যাই হোক, কেউ ফিরিয়ে আনতে পারবে না, ঠিক ঐ সব পালকের মত। সবাই জানবে, সবাই বলবে যে তার চোখ টেরা। কেঁদে মরলেও এই ধারনা কেউ পাল্টাতে পারবে না। সেদিন থেকে মেয়েটি পরের নিন্দা করা ছেড়ে দিল।

২২১। নতুন পাজামা



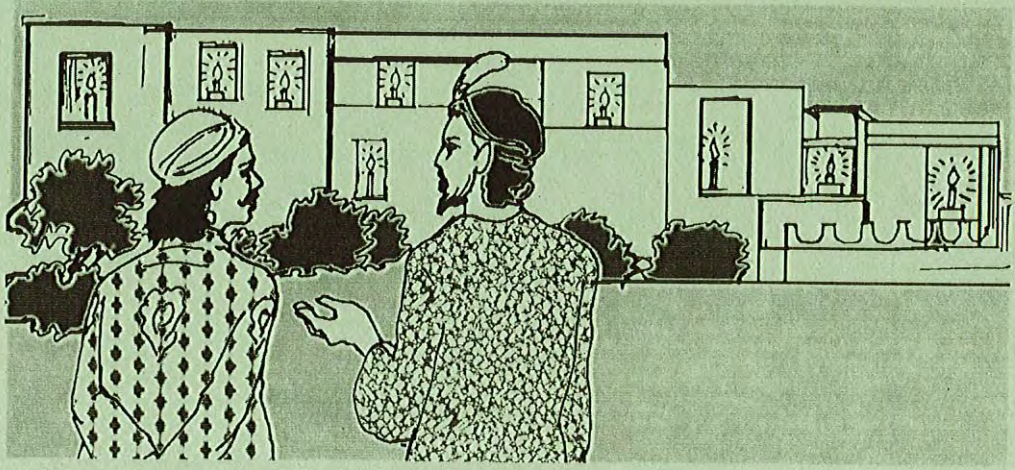


শাহীন আজ নতুন পাজামা পেয়েছে। পাজামাটা পরে তার মন খারাপ হয়ে গেল। পাজামা বড় হয়েছে, ছোট না করলে কালকে ওটা পরে স্কুলে যাওয়া যাবে না। শাহীন মায়ের কাছে দৌড়াল। বলল, মা, পাজামাটা কেটে দুই ইঞ্চি ছোট করে দাও, নইলে কালকে পরতে পারব না। মা বলল, এখন কাজ করছি, রেখে যাও। পরে কেটে সেলাই করে দেব। শাহীনের দেরী সয় না। যায় বড় বোনের কাছে। বলে, আপা, আমার পাজামা দুই ইঞ্চি কেটে ছোট করে দাও। আপা বলল, রেখে যাও। পরে কেটে সেলাই করে দেব। শাহীন দৌড়ে গেল শেফালীর কাছে। বলল, আপা, আমার পাজামা দুই ইঞ্চি কেটে ছোট করে দাও। শেফালী পাজামাটা কেটে সেলাই করে দিল। শাহীন পাজামাটা পরে দেখল। হ্যাঁ, এবার ঠিক হয়েছে। মনের আনন্দে পাজামাটা খুলে রেখে মাঠে খেলতে গেল। এদিকে বড় আপার কাজ শেষ হয়েছে। সে শাহীনের পাজামাটা কেটে সেলাই করে দিল। মায়ের কাজও শেষ হয়েছে, সেও পাজামাটা কেটে সেলাই করে শুতে গেল। সকাল বেলা। শাহীন স্কুলে যাবে। সে তাড়াতাড়ি গোসল সেরে নিল। আজ তার খুব খুশী লাগছে, নতুন পাজামা পরে স্কুলে যাবে। সে ঘরে এসে পাজামাটা পরল। পরে অবাক হয়ে গেল। একি! তার পাজামা ছোট হয়ে হাটু পর্যন্ত উঠে গেছে। সে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল...

২২২। রাজার জন্মদিন



এক সময় চীন দেশের রাজার মত ক্ষমতাশালী রাজা আর কেউ ছিল না। একদিন তার জন্মদিন উপলক্ষে রাজা তার প্রধান মন্ত্রীকে বললেন, এই দশ লাখ টাকা নাও। আজ রাত্রে সব বাড়ীতে বাড়ীতে একটা করে মশাল জ্বালিয়ে আনন্দ করা হোক। রাত্রে রাজা দেখতে গেলেন। প্রত্যেকের বাড়ীতে একটা করে মোমবাতি জ্বলানো হয়েছে। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, আমার এত টাকায় এইটুকু আলো হয়েছে ? মন্ত্রী বলল, জাঁহাপনা, আপনার কর্মচারীরা কষ্ট করে টাকা দিয়ে এসেছে, তবে তাদেরও তো বাঁচতে হয়। কিছু টাকা তাদের হাতে থেকে গেল। রাজা বললেন, আচ্ছা আজ আমি নিজেই যাব। বিকালে রাজা নিজে বাড়ী বাড়ী গিয়ে আরো দশ লাখ টাকা বিলি করে দিলেন। রাত্রে রাজা দেখতে গেলেন। এবার প্রত্যেক বাড়ীতে দেখলেন ছোট একটা কুপি জ্বলছে। প্রধান মন্ত্রীকে জিজ্ঞাস করলেন, কেন এমন হল? মন্ত্রী বলল, আপনার কর্মচারিরা আপনার পিছনে পিছনে গিয়ে প্রত্যেকের কাছ থেকে তাদের পাওনা আদায় করে নিয়েছে। তাদেরও তো বাঁচতে হয়। চাকর রাখলে লাভও হয়, লোকসানও হয় মহারাজ।



২২৩। সুখের ঠিকানা

দীপুর ত্রিশ বছর বয়স। তার আছে স্ত্রী, চার বছরের মেয়ে, বাড়ী-ঘর ও জমি জমা। তবুও তার মনে শান্তি নেই। একদিন সুখের সন্ধানে বের হল। দুই দিন হেঁটে এক সন্ধায় এসে পড়ল গভীর বনের মাঝে। বন্য পশুর ভয়ে গাছের তলে ঘুমাতে চাইল না। জুতা খুলে, যে দিকে যাচ্ছিল সেই দিকে মুখ করে রেখে দিল যাতে সকালে তার ভুল না হয়। তারপর গাছে উঠে ডালগুলোর উপরে ঘুমিয়ে পড়ল। রাত্রে একটা ভাল্লুক সে পথ দিয়ে গেল। জুতার গন্ধ পেয়ে নাক দিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখল। তাতে জুতার মুখ ঘুরে গেল। সকাল হলে দীপু গাছ থেকে নেমে জুতা পায়ে দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলল। সে যতই এগিয়ে যায় তার মন তত খুশী লাগে। মনে হয় যেন এই মাঠ, এই নদী, এই পাহাড়, তার অনেক দিনের চেনা! এক সময় সে এক গ্রামে এসে পৌঁছল। গ্রামটা দেখতে ঠিক তার গ্রামের মত। লোকগুলোর মুখ যেন





চেনা চেনা। একটা বাড়ীর সামনে পৌঁছল, তার বাড়ীর মত দেখতে। বারান্দায় একটা মহিলা বসা ছিল, ঠিক তার স্ত্রীর মত দেখতে। বাড়ীর উঠানে চার বছরের একটা মেয়ে খেলা করছিল। মেয়েটি চিৎকার করে উঠল, বাবা! বাবা! বলে, তার কাছে দৌড়ে এল। মহিলাটি হেঁসে হেঁসে এক জগ পানি এনে বলল, হাত মুখ ধুয়ে নাও, আমি ভাত বেড়ে দিচ্ছি। দীপু সব বুঝে ফেলল। ভাবল, আগে যেভাবে ছিলাম ভালই ছিলাম। না হলে কি ঈশ্বর আমাকে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনত ?

২২৪। ছোট বোন

তার বয়স ছিল পাঁচ বছর, আমার বয়স দশ। তখন ক্লাস ফোরে পড়তাম। ক্লাসে আমি ছিলাম ফার্স্ট। বই পড়তে ভালবাসতাম। সেদিন এনেছিলাম একটা ছবিওয়ালা বই, তুষার কন্যা। আমি স্কুল থেকে এসে সাইকেল চালাতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আমার পুরাতন সাইকেলের নানা রকম রোগ, তাই থামতে হল মেরামত করার জন্য। আমার খুব রাগ হচ্ছিল। ঠিক সে সময় আমার বোন এল। তার অভ্যাসমত আমার ব্যাগ খুলে দেখল কোন রঙিন ছবির বই আছে কি না। তুষার কন্যা বইটি পেয়ে আমার কাছে দৌড়ে এল। বলল, ভাইয়া, আমাকে এই গল্পটা পড়ে শুনাও না! দেখ কি সুন্দর ছবি!



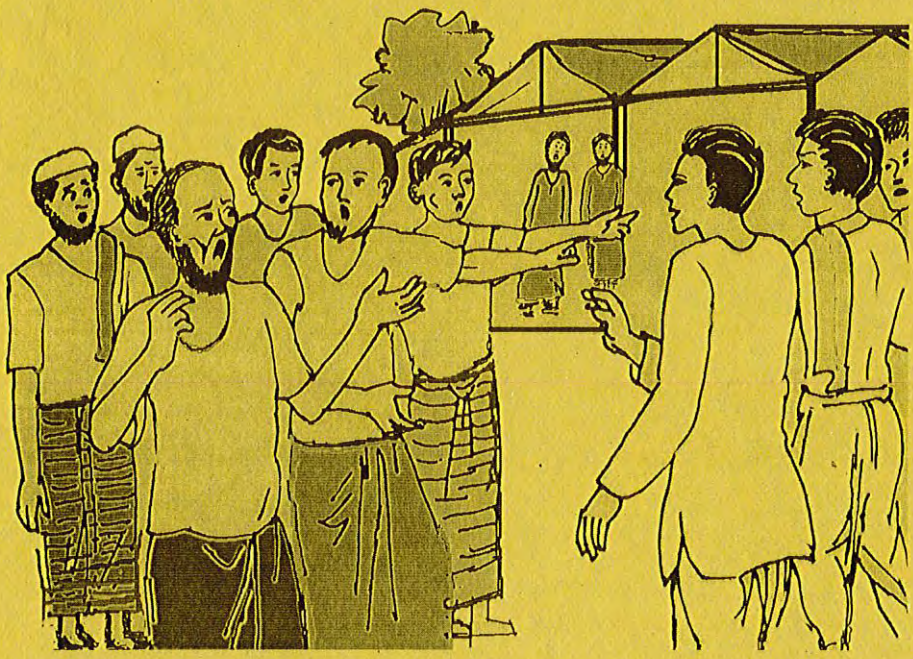
আমি বললাম, দেখছ না, আমি সাইকেল মেরামত করছি? কালকে পড়ে শোনাব। এখন বিরক্ত করো না, যাও। কিন্তু বোন ছাড়ল না। বলল, আচ্ছা... অন্ততঃ প্রথম পৃষ্ঠাটা পড়ে শোনাও। আমার রসগোলার অর্ধেকটা তোমাকে খেতে দেব। আমি আরো রাগ করে বললাম, না! আগামীকাল! কিন্তু সেই আগামীকাল তার জন্য আর আসেনি। বিকালে মায়ের সঙ্গে রিক্সায় করে বেড়াতে গেল। একটা ট্রাক এসে খুব জোরে রিক্সাটাকে ধাক্কা দিল। মাথায় আঘাত খেয়ে আমার বোন সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। কত কেঁদেছি! আমি যদি জানতাম, এটা তার শেষ অনুরোধ, তবে সারাদিন ও সারারাত তাকে গল্প পড়ে শুনাতাম। সারা জীবন আমি ভুলতে পারব না তার শেষ কথা, "অন্তত এই প্রথম পৃষ্ঠা পড়ে শোনাও, আমি অর্ধেক রসগোলা দেব.... "



২২৫। জাতি

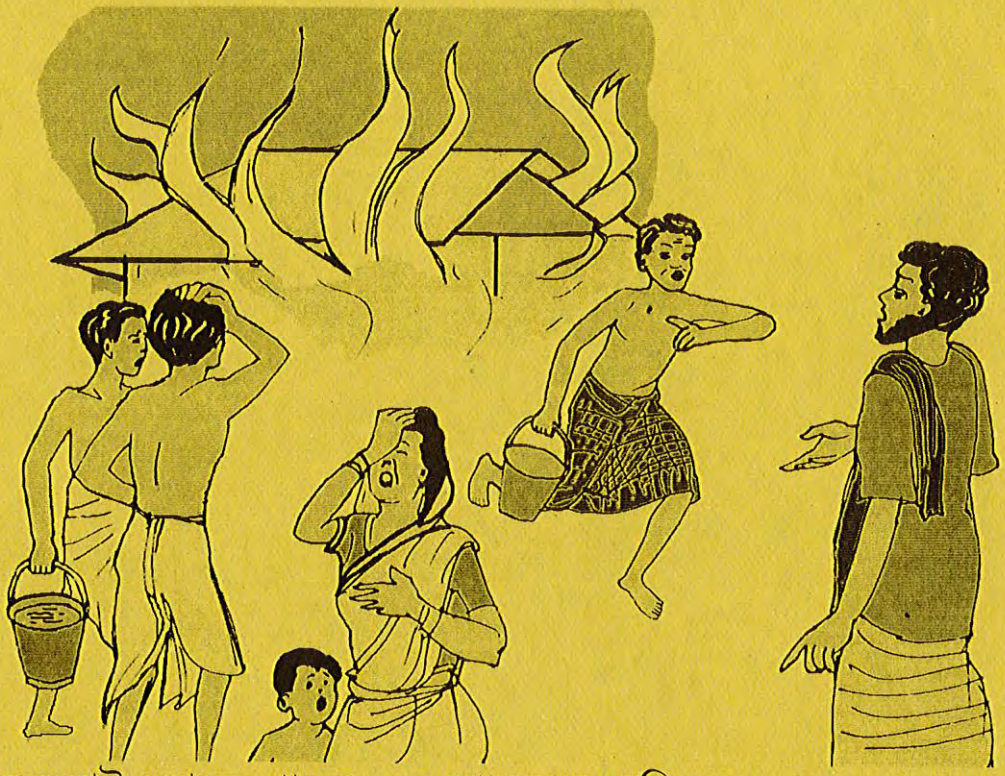
মধুপুরে হিন্দু ও মুসলমান দুটি পাড়া। বাপ-দাদার আমল থেকে কোনদিন তাদের মধ্যে জাতি নিয়ে গোলমাল হয়নি।

দু'বছর আগে গ্রামের লোকেরা কালু মিয়ার কাছে ঋণ নিত। একশ টাকা নিলে দুশ টাকা সুদ দিতে হত। না দিলে জমি তার কাছে বন্ধক রাখতে হত। কিন্তু একদিন তারা সবাই মিলে একটা সমবায় সমিতি গঠন করল। তারপর থেকে কালু মিয়ার কাছে কেউ জমি বন্ধক রাখে না, আর কেউ টাকা নিতেও আসে না। যত জমি তার কাছে বন্ধক ছিল এ বছর সব ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। রাগে তার বুক ফেঁটে যায় কিন্তু সে কিছু বলতে পারে না। শেষে তার মাথায় এক বুদ্ধি এল।



নুরুলের সাথে দেখা হলে বলল, হিন্দুরা কি বলে বেড়াচ্ছে শুনলে তো? আমরা নাকি কুকুরের জাত! শুনে নুরুল ক্ষেপে গেল, সব মুসলমান ক্ষেপে গেল। হিন্দুদের সঙ্গে মারামারি হল। সমবায় সমিতি ভেঙ্গে গেল।

কালু মিয়ার দিন ফিরে এল। এখন সবাই আবার তার কাছে ঋণ নিতে আসে, জমি বন্ধক রাখে, মারামারি হলে কালু মিয়া বিচার করে ও লোকের কাছে ঘুষ খায়। এদিকে রাগারাগি ঠান্ডা হয়ে গেলে আস্তে



আস্তে সবাই বুঝতে পারল, কে গোলমাল বাধিয়েছে। তারা মনে মনে দুঃখ করল কিন্তু গ্রামে আর শান্তি ফিরে এল না।

একদিন কিন্তু বিমলের ঘরে আগুন ধরে গেল। আলম সঙ্গে সঙ্গে বালতি নিয়ে আগুন নিভাতে গেল। পরদিন তার সঙ্গে দেখা হলে কালু মিয়া বলল, তওবা তওবা, তুমি আমাদের জাত ডুবিয়ে দিলে! আলম বলল, কালু, আমি তোমার জাত নই, তুমি সুদ খাওয়া জাত, আমি সৎ মানুষের জাত। কথাটা শুনে মুসলমান হিন্দু দুই পাড়ার লোক সবাই হাসল। পরদিন আবার সমবায় সমিতির মিটিং হল।

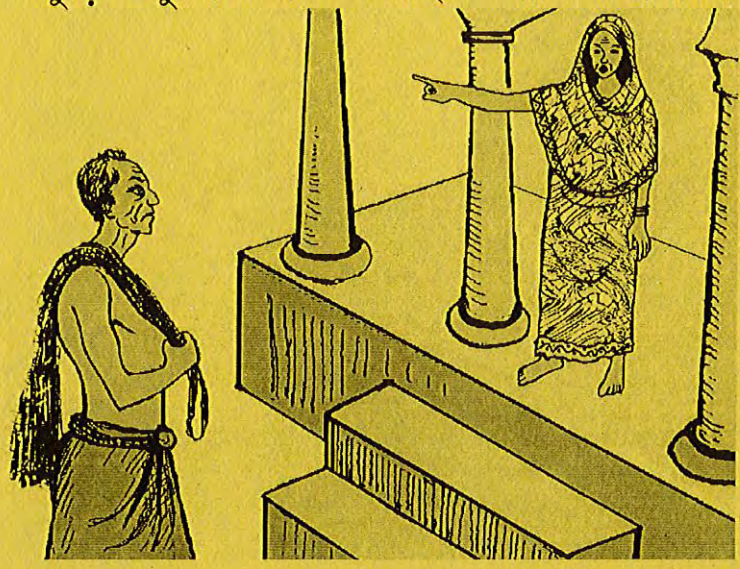
২২৬। সোনালী মাছ



এক বুড়ো জেলে ছিল, খুব গরীব, দিনে আনে দিনে খায়। জেলের বউ সারা দিন শুধু নালিশ করে ও তার ভাগ্যের দোষ দেয়। কিন্তু একদিন বুড়ি কাপড় কেঁচে ঘরে ফিরে এল। হঠাৎ দেখতে পেল, ঘরের চালে আর কোন ছিদ্র নেই। আগে ছাউনি দিয়ে আকাশ দেখা যেত। ছাউনি নতুন গোলপাতা দিয়ে ছাওয়া। বলল, কই, বুড়োকে এ কাজ করতে দেখিনি তো...? তারপর রান্না করতে গিয়ে দেখল হাড়িভরা গরম ভাত, আর কড়াইতে বড় একটা ভাজা মাছ। বুড়ি অবাক হয়ে চেয়ে রইল।এমন সময় বুড়ো জেলে ফিরে এল। এসে বলল, আজ কিছু পেলাম না, সমুদ্রে যা বাতাস! না খেয়ে থাকতে হবে বুঝি। বুড়ি বলল, কেন, এই বড় মাছ আর এই গরম ভাত কে খাবে? বুড়ো অবাক হয়ে গেল। তারপর খেতে খেতে বলল, বুঝেছি, এক সোনালী মাছ ধরেছিলাম। মাছটা আমাকে এত অনুনয় করল যে আমি ছেড়ে দিলাম। তখন সে বলল, আমার কাছে কি চাও? আমি বললাম, মাথার উপর একটা ছাউনি আর হাড়িতে চারটি ভাত থাকলে আমার আর কিছু দরকার হয় না।

বুড়ি বলল, তোমার মত বোকা বিয়ে করে আমি নিজের সর্বনাশ করেছি। একটা দালান চাইলে না কেন ?

এরপর প্রত্যেকদিন বুড়ি তাকে জ্বালাতন করতে লাগল। আর সহ্য করতে না পেরে একদিন বুড়ো জেলে সোনালী মাছকে ডেকে বলল, বুড়ি একটি দালান চায়। বাড়ি এসে দেখে দালানের বারান্দায় বসে



বুড়ি শুধু বক বক করছেঃ- আমি তোমাকে বলিনি, তোমার মাথায় এতটুকু ঘিলু নেই ? চাকর-বাকর, গাড়ি-ঘোড়া, পাঁচশ বিঘে জমি চাইলে না কেন? তোমার ঘর করার চেয়ে ফকিরের ঘর করা অনেক ভাল ছিল... । সেদিন থেকে বুড়ি হরতাল করতে লাগল। রান্না করে না, ভাত দেয় না, কাপড় কাঁচে না, শুধু খায় আর শুয়ে থাকে। শেষে বুড়ো আর সহ্য করতে পারল না। আবার সমুদ্রে গিয়ে ডাকল, সোনালী মাছ, বুড়িকে গাড়ি-ঘোড়া, জমি-জমা না দিলে আমাকে না খাইয়ে মারবে। সোনালী মাছ বলল, আচছা, আমি ব্যবস্থা করছি।

এবার বাড়ি গেলে তাকে আর ঘরে ঢুকতে দেওয়া হল না। চাকর-বাকর তার ময়লা কাপড় দেখে তাকে তাড়িয়ে দিল। তেতলা থেকে বুড়ি বলল, আমার মত জ্ঞানী মহিলা এই দেশের রাণী হওয়া উচিত। যাও, আমি রাণী না হওয়া পর্যন্ত তুমি আর বাড়ি এসো না।

সোনালী মাছের দেখা পেলে বুড়ো জেলে বলল, সোনালী মাছ, বুড়ি বলছে, তার মত জ্ঞানী মহিলা রাণী হওয়া উচিৎ। তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর, তবে আমাকে শান্তি দাও। সোনালী মাছ বলল, চিন্তা নেই, আমি তার পাওনা মিটিয়ে দিচ্ছি...। বুড়ো এবার বাড়ি গিয়ে দেখল বুড়ি আগের সেই ভাঙ্গা ঘরে বসে আছে।

২২৭। কাজলা

মা রোজ কাজলাকে বকা দেয়। সে নাকি রান্না করতে পারে না, তার উপর সে কালো, কেউ তাকে বিয়ে করবে না। কাজলা মনে মনে ভাবল, আমি গলায় দড়ি







দেব। এমন সময় রোকেয়া ডাকতে এল, কাজলা, আপা ডাকছে। স্কুলে সবাই তোমার জন্য অপেক্ষায় আছে। আপা বলল তুমি না এলে কাজ হবে না, চল...

আপা বলল, ছেলেমেয়েরা, এই নাও, একটা করে কাগজ দিচ্ছি। প্রত্যেকটি কাগজে সবার নাম লেখা আছে। তোমরা নামের পাশে লিখবে, কার কি গুন আছে, আর সে কি ভাল কাজ করে। কাজলা তার লেখাটা শেষ করে বাড়ি চলে গেল।

সেই লিচু গাছে গিয়ে উঠল ও দড়িটা বাধঁতে লাগল। হঠাৎ রোকেয়া আবার এল,

• কাজলা... এই নাও, আপা পাঠিয়েছে। তোমার নামে সবাই কি লিখেছে আপা একটা কাগজে লিখে দিয়েছে, পড়ে দেখ!





• বাঃ বাঃ! শোনঃ- আমি একা ছিলাম, কাজলা আমার সঙ্গে খেলতে এসেছে, তার কালো কোকড়ানো চুল দেখতে খুব ভাল লাগে... তার মত কেউ দৌড়াতে পারে না, যখন হাসে তখন তাকে পরীর মত দেখায়, হাতে কিছু থাকলে সবার সঙ্গে ভাগ করে খায়... সত্যি কি তোমরা এ সব লিখেছ আমার জন্য?

• আরও কত কি লিখেছে। আচ্ছা, লিচু গাছে এই দড়িটা কি জন্য?

• আমি গলায় দড়ি দিতে যাচ্ছিলাম... কিন্তু ... আর দেব না, এস, দড়িটা দিয়ে একটা দোলনা তৈরী করি।

• না কাজলা, এখন না! আপা দুঃখ পাবে। আজ স্কুলে আমাদের গল্প লিখতে হবে, মনে নেই? স্কুলে চল, তাড়াতাড়ি!



কাজলার গল্প লিখতে সময় লাগল না. আপা তার কাগজটা নিয়ে পড়তে লাগল....."আমি যখন গলায় দড়ি দিতে যাচিছলাম, তখন আপা সেই কাগজটা পাঠিয়ে দিল। কাগজটা পড়ে আমি বুঝতে পারলাম সবাই আমাকে ভালবাসে। কিন্তু এতদিন ওরা এই কথা বলেনি কেন? কাজলা, তোমার গল্পের মত সুন্দর গল্প কেউ লেখেনি... আরে! সে কি! কাঁদছ কেন?



• আপা... আমি যে ভাল কিছু করতে পারি, এতদিন সে কথা কেউ আমাকে বলেনি... কোন দিন বলেনি! তুমি আমাকে বলনি কেন আপা?... কেন বলনি?...

২২৮। অতি চালাকী

খলিফা হারুণের আমলে বাগদাদ নগরে এক বিখ্যাত নাপিত ছিল, তার নাম রুস্তম। চোখ বন্ধ করেও সে চুল-দাঁড়ি কামাতে পারত। তবে সে খুব চালাক ও অহংকারী ছিল।

একদিন এক কাঠুরে কিছু কাঠ গাধার পিঠে চাপিয়ে তার কাছে বেচতে এল। রুস্তম বলল, বেশ, গাধার পিঠে যত কাঠ আছে সব নেব, কত চাও ? কাঠুরে বলল, পঞ্চাশ টাকা। নাপিত তাকে পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়ে বলল, ঠিক আছে, নামাও। কাঠুরে কাঠ নামিয়ে চলে যাচ্ছিল, এমন সময় নাপিত বলল,



কই, গাধার পিঠে এখনো কাঠ রয়েছে।

- সে তো আমার বাক্স।

- না বাপু, চুক্তি ছিল ওর পিঠে যত কাঠ আছে সব দেবে, বাক্সটাও দিতে হবে। এই বলে সে বাক্সটা নামিয়ে নিল।

কাঠুরে কিন্তু খলিফার কাছে নালিশ করতে গেল। খলিফা তাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি মুখে বলনি গাধার পিঠে যত কাঠ আছে সব দিয়ে দেবে ?

- বলেছিলাম, কিন্তু বাক্সটা দেব, এমন কথা বলতে চাইনি।

- বলতে চাওনি কিন্তু বলেছ। চুক্তি করার সময় মুখের কথাই হল আসল। মনের মধ্যে কি আছে না আছে তা কেউ দেখতে যায় না। তা না হলে যেকোন আইন বাতিল করা যেতে পারে। সুতরাং বাক্সটা দিতে হবে। তারপর খলিফা তার কানে কানে কি যেন বলল। কাঠুরে খুশি

মনে বাড়ি ফিরে গেল।

– কিছুদিন পর কাঠুরে নাপিতের কাছে এসে বলল, আমাকে আর আমার সাথীকে কামাতে হবে। দু'জনের জন্য কত নেবে ? নাপিত বলল, বিশ টাকা। কাঠুরে বিশ টাকা তার হাতে গুণে দিয়ে চেয়ারে বসল। তার চুল দাঁড়ি কামিয়ে নাপিত বলল, তোমার সাথিকে আসতে বল। কাঠুরে তার গাধা নিয়ে আসল। নাপিত বলল, সেকি! আমি মানুষকে কামাই, গাধাকে কামাই না। গাধাটা নিয়ে যাও।

– কাঠুরে খলিফার কাছে নালিশ করল। খলিফা নাপিতকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, কি চুক্তি ছিল তার সঙ্গে ?

– চুক্তি ছিল তাকে ও তার সাথীকে কামাব। কিন্তু আমি বলতে চাইনি যে তার গাধাকে কামাব। খলিফা বলল,

– বলতে চাওনি কিন্তু বলেছ। চুক্তি করার সময় মুখের কথাই হল আসল। মনের মধ্যে কি আছে না আছে তা কেউ দেখতে যায় না। সুতরাং গাধাকে কামাতে হবে।

তখন খলিফার কাছে গাধাটা আনা হল। বাজারের সমস্ত লোক তার পিছু পিছু এল। নাপিত তার গায়ে সাবান মাখিয়ে গাধাটা কামাতে লাগল। মাথা থেকে পা পর্যন্ত নিখুঁতভাবে গাধাটা না কামানো পর্যন্ত খলিফা সেখানে বসে রইল।



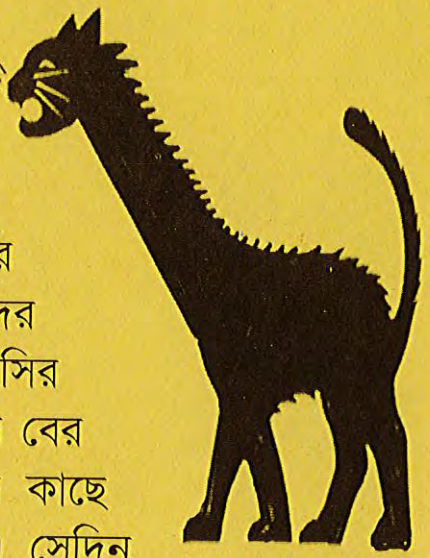
২২৯। কালো বনের খোক্কস



হিমালয় পাহাড়ের গায়ে একটা বন ছিল। গাছ এত ঘন যে, সবাই সেটা কালো বন বলে ডাকত। সেই বনে বাস করত রাক্ষস আর খোক্কস। রাক্ষস মানুষের মত দেখতে। তারা মানুষ খায়, মানুষ না পেলে সাপের মাথা খায়। খোক্কস কিন্তু দেখতে মানুষের মত নয়। তারা বিরাট পশুর মত। তারা খাঁচার ভিতরে মানুষ পোষে আর দিনে একটা করে খায়। একদিন কিন্তু সর্বনাশ হয়ে গেল। একটা খোক্কস তার খাঁচা খোলা রেখে শুতে গেল। ভিতরে যত মানুষ ছিল, রাতে সবাই পালিয়ে গেল। খোক্কস গাছ-পালা ভেঙ্গে ভেঙ্গে কালো বন থেকে বেরিয়ে এল।



লোকজনকে ধাওয়া করে চারজনের মাথা খেয়ে ফেলল। রাত্রে রাজা সভা ডাকল। বলল, ভাই সব, কালকে যদি খাবার জন্য খোক্কস কোন মানুষ না পায় তাহলে শহরে এসে অনেক লোক মেরে ফেলবে। আমাদের সকলের নাম আমি কাগজে লিখে, এই কলসির ভিতরে রেখে দিলাম। প্রতিদিন একটা নাম বের করা হবে। যার নাম উঠবে সে খোক্কসের কাছে যাবে আর বাকি সবাই আমরা রক্ষা পাব। সেদিন থেকে একজন একজন করে লোকেরা বনে মরতে গেল। কিন্তু একদিন যখন কাগজটি বের করা হল, তখন রাজধানীতে সবাই কাঁদতে শুরু করল। ছোট রাজপুত্রের নাম উঠেছিল। বয়স বার বছর। ছেলেটা বলল, বেশ, আমি প্রস্তুত।





তার বোনের বয়স আঠার বছর। সে বলল, বাবা, আমার ভাইকে মরতে দেব না। তার বদলে আমি যাব। রাজা বলল, তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে মা। তোমার ভাইয়ের বদলে আমি যাব।

রাজা বিদায় নিয়ে মরতে গেল। কিন্তু এক যুবক তার পিছনে এল। রাজা বলল, তুমি মরতে এলে কেন?



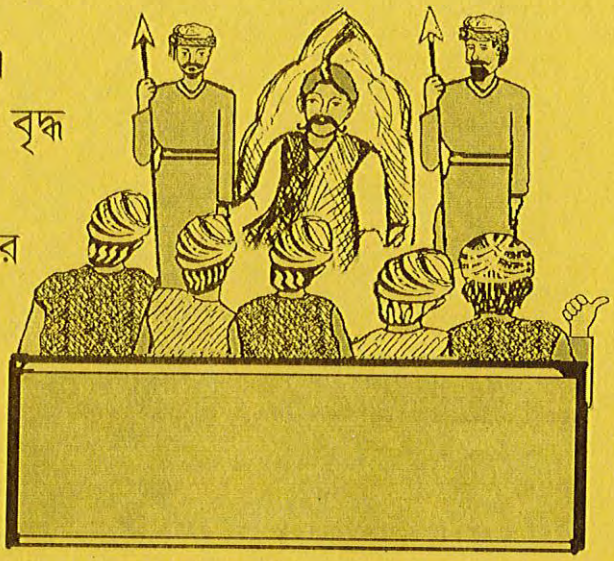
- আমি মরতে আসিনি মহারাজ, শিকার করতে এসেছি।
- এক্ষনই ফিরে যাও! রাজার হুকুম!
- আমি আপনার প্রজা নই। আপনার হুকুম আমি মানি না। যুবকটি আগুন জ্বালাল ও তীর দিয়ে একটা মশাল তৈরী করল। যেই খোক্কস তাকে গ্রাস করতে এল, সে তার গলায় জ্বলন্ত তীর ছুঁড়ে মারল। খোক্কস পাগলের মত লাফাতে লাফাতে পড়ে গেল, আর নড়ল না।





রাজা এবার জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে? সত্যি কথা বল। যুবকটি বলল, আমি পাশের দেশের যুবরাজ। গত রাত্রে আপনার সভায় উপস্থিত ছিলাম, আপনার কন্যাকে দেখলাম ও তার কথা শুনলাম। যদি আমাকে তার যোগ্য মনে করেন, তবে আমি তাকে বিয়ে করতে চাই। রাজা হেসে বলল, তুমি যোগ্য হবে কেন? তোমার চেয়ে অবাধ্য ছেলে আমি দেখিনি!... তাদের কথা শেষ হল না। রাজধানী থেকে মানুষ দৌঁড়ে এল। রাজকন্যা বাবার গলা জড়িয়ে ধরল, তারপর যুবকটির দিকে চেয়ে রইল। পরের দিন তাদের দুজনের বিয়ে হল।

২৩০। বৃদ্ধ মন্ত্রী





এক রাজা ছিল। তার প্রধান মন্ত্রী বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। লাঠিতে ভর দিয়ে রাজসভায় আসত। দুই ঘন্টার মধ্যে কর্মচারীদের কাজ ভাগ করে দিয়ে চলে যেত। কর্মচারীরা ভাবত, ঐটুকু কাজের জন্য সে আমাদের চেয়ে তিন গুণ বেশী মাইনে পায়। একদিন সবাই মিলে রাজাকে গিয়ে বলল, মহারাজ, বৃদ্ধকে এত টাকা মাইনে দিয়ে রাখেন কেন?। তার সমস্ত কাজ তো আমরাই করি। আমাদের মাইনে একটু বাড়িয়ে ওকে ছেড়ে দিন। এতে সকলের লাভ হবে। রাজা বলল, বেশ, তোমরা যখন বলছ, আমি চিন্তা করে দেখব। এবার তোমরা যে যার কাজে যাও... হ্যাঁ, তুমি একটু দাঁড়াও ... আমার কুকুরটির বাচ্চা হয়েছে শুনলাম। তার অবস্থা একটু দেখে এস।

কর্মচারীটি গিয়ে খবর নিয়ে আসল।

- তার অবস্থা ভালোই।

- বাচ্চা কয়টা ?

লোকটি গিয়ে খবর নিয়ে আসল, চারটি বাচ্চা হয়েছে মহারাজ।

- কয়টা মর্দা, কয়টা মাদী ? লোকটি আবার গিয়ে খবর নিয়ে আসল, একটা মর্দা, তিনটে মাদী।

- কয়টা সাদা, কয়টা কালো ? লোকটি আবার গেল। ফিরে এসে বলল, দুটো সাদা, একটা কালো আর একটা সাদা-কালো।

- মর্দা কি রঙের ? লোকটা আবার গিয়ে খবর নিয়ে আসল, সাদা-কালোটা মর্দা।

রাজা তাকে বিদায় দিয়ে একজন একজন করে সব কর্মচারীদের ডেকে কুকুরের খবর আনতে পাঠাল। খবর আনার জন্য সবাইকে পাঁচ-ছয় বার যেতে হল। শেষে রাজা তাদের সবাইকে একসঙ্গে এনে প্রধান মন্ত্রীকে ডেকে পাঠাল। তারা ভাবল, এবার বুঝি রাজা প্রধান মন্ত্রীকে বিদায় দেবে। রাজা প্রধান মন্ত্রীকে বলল, আমার কুকুরের অবস্থা দেখে এস তো। বুড়ো লাঠিতে ভর দিয়ে চলে গেল। ফিরে এসে বলল, আপনার কুকুর ভালোই



আছে। তার চারটি বাচ্চা হয়েছে। তিনটি হয়েছে মাদী, একটি হয়েছে মর্দা। মর্দা হয়েছে সাদা-কালো। মাদী হয়েছে দুটো সাদা, একটা কালো। এবার রাজা সবাইকে বলল, আজকের মত তোমরা যেতে পার। সেদিন থেকে কর্মচারীরা মন্ত্রী হওয়ার আশা ছেড়ে দিল।

২৩১। ভাষ্যকার

- স্যার, বকুর চাচা উকিলের কাজ করে। যে তাকে বেশী টাকা দেয় সে তার পক্ষে ভাষন দেয়। গতকাল বাজারে কি বলল জানেন? মহেশখালির লোকেরা বন্যার পরে আমাদের গ্রাম দখল করেছে, তাদের তাড়িয়ে দিতে হবে।



- সে বলেছে, তাতে কি?
- ওদের গ্রাম আর নেই স্যার। ঘর বাড়ি কিছু নেই, মাটি পর্যন্ত নেই। জায়গা না দিলে ওরা যাবে কোথায়? সে কি ভাল কথা বলে?
- অবশ্যই না। ও বোকার মত কথা বলে।
- লোকটাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে স্যার!
- দাড়াও, আমি বলিনি যে তাকে তাড়িয়ে দিতে হবে, এই দেশ হল স্বাধীন দেশ। সবাই তাদের মতামত বলতে পারে। আজ চারটার সময় সে আবার হাটে ভাষন দেবে। তোমরা গিয়ে প্রতিবাদ কর!

স্যার চলে গেলে পুঁই বলল, আমরা ভাষনের সময় যদি কথা বলি সবাই বকা দেবে।



- আচ্ছা ভাইয়া, আমাদের হাটখোলায় তিন গ্রামের লোক বাজার করতে আসে। এই তিন গ্রামে তিনটে স্কুল আছে। মোট কজন ছেলেমেয়ে হবে?
- কম পক্ষে পাঁচশ তো হবেই...। কেন?

এবার শিমকি পুঁইএর কানে কানে কি যেন বলতে লাগল। পুঁই হাসল।



- তোমার বুদ্ধি মন্দ না, চল তিনটে স্কুলে খবর দিয়ে আসি। হাটখোলা ছেলেমেয়েতে ভরে গেল। চারটার সময় তারা ভদ্র ভাবে মঞ্চের সামনে এসে দাড়াল, ছোটরা সামনে, বড়রা পিছনে। পুঁই ও শিমকি ছিল সকলের সামনে। উকিল সাহেব ভাষন দিল, " ভাই সব, এই এলাকার মত সুন্দর জায়গা কি জগতে আর আছে? না, সারা জগতে আর নেই...

পুঁই ও শিমকি হাততালি দিল, সব ছেলেমেয়েও হাততালি দিল। হাটের লোকেরা কাছে এসে ভিড় করল। উকিল বলল, "দুঃখের বিষয় মহেশখালি থেকে গত সপ্তায় যে সব লোকেরা এসেছে, তারা আমাদের এলাকা নষ্ট করে ফেলেছে...। এবার পুঁই ও শিমকি আস্তে আস্তে মঞ্চের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাড়াল। তাদের দেখাদেখি সব ছেলেমেয়েরা পিঠ ফিরাতে লাগল। হাটের লোকেরা হাসল, তারপরে একজন একজন করে তারাও পিঠ ফিরাতে লাগল। উকিল সাহেব চোখে অন্ধকার দেখল। কিছুক্ষন ধরে আবল তাবল বকতে লাগল, কিন্তু তার অবস্থা দেখে বড়রা, ছোটরা, সবাই হাসতে হাসতে হাট বাজার কাঁপিয়ে তুলল। লজ্জায় উকিল মঞ্চ ছেড়ে পালাল। সবাই কেনাবেচা করতে করতে বলতে লাগল, আমাদের ছেলে-মেয়েদের জ্ঞান-বুদ্ধি আছে কিন্তু!



২৩২। সেরা ব্যবসায়ী

মদিনা শহরে এক ব্যবসায়ী ছিল। সারা জীবন সে ব্যবসা করেছে। ব্যবসা করে বুড়ো হয়েছে। এবার ব্যবসার পুঁজি তার এক সন্তানের হাতে দিয়ে বিশ্রাম করবে। একদিন তাদের ডেকে বলল,

ছেলেমেয়েরা শোন, আমি তোমাদের একজনকে আমার ব্যবসার পুঁজি দিতে চাই। সে ব্যবসা চালাবে। আমরা তার কথা মেনে চলব। তবে লাভ সমান ভাগে আমাদের চারজনের মধ্যে ভাগ করা হবে।

বড়জন জিজ্ঞাসা করল, টাকা থাকবে কার কাছে?

বাবা বলল, এখনও আমি কোন সিদ্ধান্ত নিইনি। এক কাজ করা যাক। ঐ দেখ, আমাদের বাড়িতে তিনটি কামরা খালি আছে। তোমরা একটা করে নাও। তারপর বাবা বলল, এই নাও, একশ টাকা করে দিচ্ছি, তাই দিয়ে কামরাটা ভরিয়ে দিতে হবে। যেন কোন ফাঁক না থাকে।



বড় ছেলে বাজারে গেল। বাজারে সে একশ টাকার কোন জিনিষ পেল না যাতে কামরাটা ভর্তি হতে পারে। তখন সে গ্রামে খুঁজতে গেল। বাড়িতে বাড়িতে চাষীরা ধান মাড়াই করছিল। অনেক দর কষাকষির পর সে একশ টাকার খড় কিনল। পাঁচটা গরুর গাড়িতে খড় নিয়ে এসে রাত দশটা পর্যন্ত কাজ করে কামরাটা ভরিয়ে দিল।

মেজো ছেলে বাজারে গিয়ে চায়ের দোকানে বসে ভাবতে লাগল। হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। বাবা তো একশ টাকা দিয়ে কামরা ভরিয়ে দিতে বলেছে। একশ টাকার জিনিষ কিনতে বলেনি।

একটা লোক তুলা ধুনছিল। তাকে গিয়ে বলল, আমার জন্য একটা কাজ করতে হবে। এক বস্তা তুলা নিয়ে আমাদের বাড়িতে ধুনবে। আমি দেখব একটা কামরা ভর্তি করার জন্য কয় বস্তা তুলা লাগে। তার জন্য কত নেবে?

পঞ্চাশ টাকা নেব। এক্ষনই চলুন।

মেয়েটি বাজারে গেল না। বাড়ি বসে কিছুক্ষন চিন্তা করল, তারপর সেই একশ টাকার নোটটা ভাঙ্গিয়ে দুই টাকা খরচ করল। বাকি টাকা বাবাকে ফিরিয়ে দিয়ে বেড়াতে গেল।

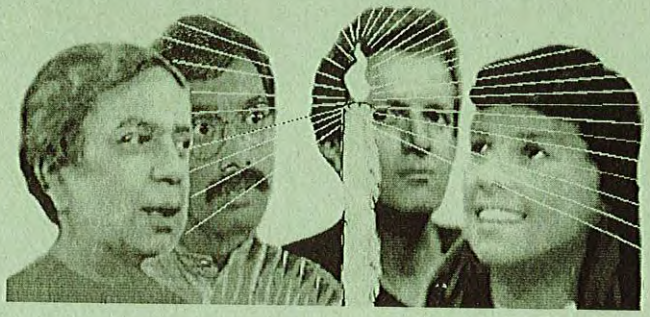
রাত্রে বাবা তিনটি কামরা দেখতে গেল।

বড় ছেলেকে বলল, বাঃ তুমি যে এত বড় কামরা ভরিয়ে দিতে পারবে তা আমি ভাবতেই পারিনি। কত টাকা লাগল? সে বলল, একশ টাকা।

মেজো ছেলেটার কামরা দেখে বলল, বাঃ কি করে পারলে একশ টাকা দিয়ে এত তুলা কিনতে? ছেলেটা বলল, আমি তুলা ধার নিয়েছি বাবা। পঞ্চাশ টাকায় কাজ হয়েছে, বাকি টাকা বন্ধুদের সঙ্গে খরচ করেছি।

মেয়েটির কামরা দেখে বাবা দুঃখ পেল। বলল, কেন ভরিয়ে দিলে না ?

মেয়েটি কামরার মাঝখানে একটা মোমবাতি দাড় করেছিল। এবার একটা ম্যাচের কাঠি দিয়ে মোমবাতিটা জ্বালিয়ে দিল। কামরাটা আলোতে ভরে গেল। সকলে হাঃ করে রইল। শেষে বাবা বলল, মা, আমাদের ব্যবসার পুঁজি তোমার হাতে থাকবে। আজ থেকে তুমি ব্যবসা চালাবে আর আমরা তোমার সঙ্গে কাজ করব। আল্লাহ তোমাকে জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েছে। তোমার কাছে টাকা থাকলে আমরা বিপদে পড়ব না, ইনশাআল্লাহ !



২৩৩। হাতেমতাই

এক দেশে এক রাজা ছিল। সে তার প্রজাদের প্রশংসা পাওয়ার জন্য অনেক টাকা খরচ করত, গরীবদের সাহায্যে করত, বিপদে পড়লে তাদের রক্ষা করত, এতিম শিশুদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা করত। লোকেরা বলত এমন রাজা কোনদিন দেখিনি। দেশে একটি সৎ মানুষ ছিল, তার নাম হাতেমতাই। তার অল্প জমিজমা, তার বাড়ী খুব ছোট, কিন্তু লোকেরা তার কাছে গেলে সব সময় আদর পেত। একদিন রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, আমার রাজ্যের লোকেরা কাকে বেশি ভালবাসে? মন্ত্রী বলল, মহারাজ, দূরের এক গ্রামে হাতেমতাই নামে একটা লোক আছে, লোকেরা তাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে।



মন্ত্রীর কথা শুনে রাজা খুব দুঃখ পেল। রাত্রে সেনাপতিকে ডেকে বলল, হাতেমতাই আমার শত্রু ও দেশের শত্রু তোমার সবচেয়ে ভাল সৈনিক নিয়ে কাল সকালে হাতেমতাইএর কাছে যাও, তাকে বলবে, মহারাজ তোমাকে যেতে বলেছে। নদী পার হওয়ার সময় তাকে মেরে পানিতে ফেলে দেবে। কেউ যেন তা জানতে না পারে।

সেনাপতি সৈনিকের সঙ্গে পরের দিন সকালে যাত্রা করল। গ্রামে যেতে সারা দিন লাগল। হাঁটতে হাঁটতে দুজনে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ল। যখন গ্রামের কাছে পৌছে গেল তখন একটা লোক নৌকা বেয়ে তাদের পার করে দিয়ে তাদের অবস্থা দেখে বলল, চল আমার বাড়ীতে চারটি খেয়ে বিশ্রাম নেবে। লোকটির মুখে হাসি। খাওয়া-দাওয়ার পর লোকটি হাসিমুখে আবার বলল, তোমরা খুব ক্লান্ত, রাত্রে আমার বাড়ীতে থেকে

যাও। তারা থেকে গেল। ভোরে উঠে সেনাপতি বলল, তুমি আমাদের বাঁচালে, তোমার নাম কি ভাই? লোকটি বলল, আমার নাম হাতেমতাই। সেনাপতি অবাক হয়ে ভাবল, এই লোকটি দেশের শত্রু হতে পারে না। সারা দিন গ্রামটা ঘুরে ঘুরে সবার কাছে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, তুমি কি হাতেমতাইকে চেন? সবাই হেসে বলল, তাকে না চেনে এই গ্রামে এমন কেউ আছে? সে আমার বন্ধু হয়।





- লোকটি যে তোমার বন্ধু তা জানলে কি করে?
- সে আমার ছেলেকে সুস্থ করেছে। তবে তার মুখ দেখলেই চেনা যায়। সে আমাকে দেখলে সব সময় হাসে।

তখন সেনাপতি সৈনিকটাকে নিয়ে রাজার কাছে ফিরে গেল। বলল, মহারাজ, আপনি ভুল খবর শুনেছেন। হাতেমতাই দেশের শত্রুও নয়, আপনার শত্রুও নয়, এমন কি, হাতেমতাই কারও শত্রু হতে পারে না। আমি আপনাকে রক্ষা করার জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারি, কিন্তু হাতেমতায়ের মত মানুষকে আমি খুন করতে পারলাম না। তবে লোকেরা কেন আপনার চেয়ে তাকে বেশী ভালবাসে, আমি তা বুঝতে পেরেছি। আপনি উপকার করতে জানেন, এমন কি তার চেয়ে বেশী উপকার করেন, কিন্তু হাতেমতাই হাসতে জানে। উপকার মানুষের দরকার হয় বিপদের সময়। হাসি তাদের দরকার হয় সারা জীবন।





২৩৪। রাক্ষসের দাদা



দুজন ভিক্ষুক ছিল। তাদের একজন ছিল অন্ধ, আর একজন ছিল কুঁজো। একদিন কুঁজো দেখতে পেল এক বট গাছের তলায় অন্ধ লোকটি বসে বসে মাথায় হাত দিয়ে চিন্তা করছে। কুঁজোটি বলল, এত ভাবছ কেন?

• গ্রামে আর কেউ আমাকে ভিক্ষা দেয়না। এবার না খেয়ে মরতে হবে।



• আমারও একিই অবস্থা। চল, একসঙ্গে ভিক্ষা করি, আমি বলব, কুঁজোকে ভিক্ষা দাও, তুমি বলবে, অন্ধকে ভিক্ষা দাও। যেতে যেতে এক সময় কুঁজোটি বলল,পথে একটা মোটা দড়ী দেখতে পাচ্ছি, কি করি? অন্ধ বলল, আমাকে দাও, কাজে লাগবে। একটু পরে কুঁজোটি বলল, একটা কচ্ছপ হেটে যাচেছ, কি করি? অন্ধ বলল, তোমার পিঠে তুলে নাও, কাজে লাগবে। আর একটু দূরে গিয়ে কুঁজোটি বলল, কে যেন একটা চুনের হাড়ি ফেলে রেখেছে। অন্ধটি বলল, পিঠে তুলে নাও, কাজে লাগবে। যেতে যেতে এক সুন্দর তিনতলা দালান দেখে তারা অবাক হল। ভিতরে কেউ ছিল না। উপর তলায় উঠে দেখল বস্তা বস্তা ভরা সোনা, রূপা, ও মনি-মুক্তা। কুঁজোটি বলল, এইটা নিশ্চয়





রাক্ষসদের দালান। এমন সময় রাক্ষসেরা ফিরে এল। তারা দূর থেকে জিজ্ঞাসা করল, হাউ মাউ, মানুষের গন্ধ পাউ, আমাদের বাড়ীতে কারা আউ? অন্ধটি বলল, আমরা রাক্ষসের দাদা খোক্ষস, আমরা রাক্ষস খেয়ে বাঁচি। সর্দ্দার বলল, তোমরা যদি খোক্ষস হও, থুথু ফেল দেখি! কুঁজোটি রাক্ষসদের উপরে চুনের হাড়িটা উল্টিয়ে দিল। রাক্ষসরা চুনের জ্বালায় মুখ চোখ মুছতে মুছতে দশ হাত পিছে গেল। সর্দ্দার বলল, তোমরা যদি খোক্ষস হও তোমাদের মাথার একটা চুল ফেলে দাও দেখি! কুঁজো মোটা দড়িটা রাক্ষসদের উপর ফেলে দিল। রাক্ষসেরা আরও দশ হাত পিছে গিয়ে বলল, তোমরা যদি খোক্ষস হও, তোমাদের একটা উকুন ফেলে দাও দেখি! এবার কুঁজো কচ্ছপটা তাদের দিকে ছুড়ে মেরে বলল, এই নাও, এবার কিন্তু দাড়াও, আজ আমাদের খাওয়া হয় নি, হাউ মাউ....হাউ মাউ! রাক্ষসেরা ভয়তে পালাল। তখন অন্ধ ও কুঁজো, ভাগ করার জন্য বসল। কুঁজোটি ভাবল, আমি যদি মনি-মুক্তা নিই অন্ধটি জানতে পাবেনা। সে সব মনি-মুক্তা নিল। অন্ধ হাত দিয়ে দেখে বলল, কুঁজো কোথাকার, আমাকে মনি মুক্তা দাওনি কেন? চোরের বাচচা চোর! কুঁজো খুব লজ্জা পেল। এক মুঠো বালি নিয়ে অন্ধের মুখে ছুঁড়ে মারল। অন্ধটি চোখ মুছতে মুছতে তার চোখের ঘোলা আবরন উঠিয়ে দিল এবং চোখে সব দেখতে পেল। তার রাগ এত বেশী যে কুঁজোকে ধরে তার পিঠে কিল মারতে লাগল। এত কিল মারল যে কুঁজোর পিঠ একদম সোজা হয়ে গেল। তখন কুঁজোটি বলল, ভাই, আমি সোজা হয়ে গেছি, মনি-মুক্তা তুমি যত ইচছা নিতে পার। অন্ধটি বলল,ভাই, আমি সব দেখতে পাচিছ! মনি-মুক্তা আর আমার লাগবে না!



২৩৫। কালা রাবুর ঘর



কুতুবদিয়া দ্বীপে যত লোক বাস করে সবাই কালা রাবুকে চেনে। কালা রাবুর বয়স আশি, নব্বই না একশ বছর তা কেউ জানে না। কবে এই দ্বীপে এসেছে তা কারও মনে নেই। সে জন্ম থেকে কালা ও বোবা। জীবনে সে মুখ দিয়ে কোন কথা বলে নি, কানেও কোন কথা শোনে নি। তবে কালা রাবুর দুটি ধারালো চোখ আছে, তা দিয়ে সবকিছু দেখতে পায়, সবকিছু বুঝতে পারে। কালা রাবু চোখ দিয়ে হাসে। তার হাসি শিশুদের টেনে আনে একটা চুম্বকের মত । তারা রাবু বুড়ির কোলে এসে বসে, তারাও চোখ দিয়ে কথা বলে, চোখ দিয়ে কথা শোনে। মায়েরা বেড়াতে গেলে তার কাছে শিশুদের রেখে যায়। তারা জানে রাবু বুড়ি কোন ভুল করে না, কানে শুনতে পায় না, তাই প্রতি মুহূর্তে তাদের চোখে চোখে রাখে। কালা রাবুর রান্নাঘর নেই। যেখানে সেখানে খায়, কারণ গ্রামের সবাই তার কাছে ঋণী। তার একটা ছোট্ট ঘর আছে। দশ বছর আগে এই ঘর ছিল না। কালা রাবু একটা তাঁবুতে থাকত। একদিন কিন্তু একটা ঘটনা ঘটেছিল।

ঝড় তুফান হলে কালা রাবু অনেক আগে টের পায়। সেদিন হঠাৎ কালা রাবু সরকারী স্কুলের দিকে দৌড়াল। সেখানে একটা কাঁসার ঘন্টা ছিল। ঘন্টা বাজাতে বাজাতে গ্রামের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে দৌড়ে গেল। ছেলেমেয়েরা তার পিছু পিছু চিৎকার করে বলতে লাগল, ঢেউ এসে গেছে, পালাও!... সকলে ভয় পেয়ে পাকা দালানের দিকে পালাতে লাগল । আধ ঘন্টা পরে ঢেউটা এসে সারা গ্রাম ধ্বংস করে দিল। মানুষ বেঁচে গেল।

তারা কালা রাবুর জন্য তৈরী করল এই সুন্দর ছোট্ট ঘর, এখান থেকে সমুদ্রের খেলা দেখা যায়। ঐ ঘরের জন্য সবাই তাকে সম্মান করে। সবাই তাকে নানী বলে ডাকে। একদিন রাবু বারান্দায় বসে সমুদ্রের খেলা দেখছিল। তার উঠানে দুটি মেয়ে খেলা করছিল। সে সময় ভরা জোয়ার। পানি শেষ সীমানায় উঠে এসেছে। বিশজন লোক সমুদ্রের ধারে লবন তৈরী করার মাঠে নেমে গিয়েছে।ভাটা শুরু হচ্ছে কিন্তু পানি খুব দ্রুত নেমে যাচ্ছে! তারপর কি হবে, রাবু নানী ভাল করে জানে। ঢেউটা আরও পাঁচ মিনিট নেমে যাবে, তারপরে দ্রুত বেগে ফিরে আসবে। লোকেরা পালাবার সময় পাবে না। ঢেউ তাদের জড়িয়ে ধরে সমুদ্রের মাঝখানে ডুবিয়ে দেবে। কেউ ফিরতে পারবে না। লোকেরা



অনেক দূরে। চিৎকার করলে তারা শুনতে পাবে না। রাবু নানী মেয়েদের বলল, দৌড়ে ঘন্টা নিয়ে এস। তারপর ঘরে গেল। রাবু নানী হ্যারিকেন থেকে কেরোসিন তেল ঢেলে দিল বিছানার উপর, দেয়ালের গায়ে, কাপড়-চোপড়ের উপর। তারপর আগুন ধরিয়ে দিল। এক মুহূর্তের মধ্যে ধোঁয়া আকাশে উঠতে লাগল। মেয়ে দু'জন ঘন্টা পিটাতে লাগল। সবাই দৌড়ে এল, রাবু নানীর ঘর রক্ষা করার জন্য। তারা কিছু করতে পারল না। কিন্তু দুই মিনিট আগে যেখানে তারা কাজ করছিল এক বিরাট ঢেউ সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কমতে কমতে এগিয়ে আসতে লাগল। তাদের পায়ের কাছে পৌছাল, তারপর সবকিছু আলিঙ্গন করে সাগরের মধ্যে ফিরে গেল। শুধু মানুষ বেঁচে গেল, তীর পরিস্কার হয়ে গেল, তাতে কিছু রইল না।



২৩৬। মন্ত্র পড়া পানি

আমতলী সরকারী স্কুলের অবস্থা খারাপ। এমনিতে এলাকার লোকেরা খুব গরীব, তাই একটা খাতা বা কলম কেনার জন্য বাবা-মাকে দশ বার বলতে হয়। তার উপর গত সপ্তায় ক্লাস ফোরের ছেলে-মেয়েরা নালিশ করতে লাগল, তাদের কলম নাকি টিফিনের সময় কে চুরি করে নিয়ে যায়। হেডমাষ্টার নালিশ শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে যায়, বাবা-মায়েরা আর কলম কিনে দিতে চায় না। ক্লাসে লেখার সময় অনেক ছাত্র খালি হাতে বসে থাকে। হেডমাষ্টার বলল, কেউ যদি কলম চোর ধরিয়ে দিতে পারে আমি তাকে একটা ভাল পুরষ্কার দেব। পরের দিন ছোট মিন্টু স্কুলে এল একটা বোতল নিয়ে। বোতলে কমলা রঙের পানি। হেডমাষ্টার আসলে মিন্টু উঠে দাড়াল,



- স্যার আমি কলম চোর ধরিয়ে দিতে পারি।
- কি করে ধরিয়ে দেবে? তুমি কি তাকে চুরি করতে দেখেছ?
- না স্যার, কিন্তু এই পানি খেলে বুঝা যাবে। ফকির বাবা এই পানিতে মন্ত্র পড়েছে। এই দেখুন রং পালটে গেছে। এক চামচ করে খেয়ে বলতে হবে, আমি কলম চুরি করি নি। যদি কেউ মিথ্যা কথা বলে, তাহলে তার গলা দিয়ে রক্ত বের হবে স্যার, সে বোবা হয়ে যাবে, এক বছর ধরে কথা বলতে পারবে না। আপনি সবাইকে পানি খেতে দেন স্যার।

হেডমাষ্টার মিন্টুর কথামত একজন একজন করে ডেকে প্রত্যেককে এক চামচ করে পানি খাওয়াতে লাগল, পানি খাওয়ার আগে সবাই হাত তুলে বলল, আমি কলম চুরি করিনি। সবার শেষে আসল লালু। সে ভয়ে কাঁপতে লাগল, শেষে কেঁদে কেঁদে বলল, আর করব না স্যার, এই নেন স্যার, সব কলম এখানে আছে, একটাও হারায়নি স্যার... সকলে হাসল, সকলে তাদের কলম ফিরে পেয়ে খুশী হল। ক্লাশের পরে সবাই চলে গেলে মিন্টু এসে বলল, আমার পুরস্কার স্যার?



- এই নাও। এই বইতে দশটা সুন্দর গল্প আছে, পড়ে অনেক মজা পাবে। ভাল কথা মিন্টু, পানিতে রং দিয়েছ কি দিয়ে?
- ট্যাং পাউডার দিয়ে, স্যার।
- তাহলে ফকির বাবা, মন্ত্র পড়া পানি, এ সব কথা...
- আমি বানিয়ে বানিয়ে বলেছি স্যার।
- কাজটা কি ভাল হয়েছে মিন্টু?
- আল্লাহ কি মনে করবেন?
- জানিনা স্যার... অনেক চিন্তা করেছি, কিন্তু এর চেয়ে ভাল বুদ্ধি আল্লাহ আমাকে দেয়নি স্যার... ।



২৩৭। বাবার জন্য

স্বপন স্কুল থেকে পরীক্ষার ফলাফলের কাগজ নিয়ে আসল। সে বাংলা ও ইংরেজীতে ফেল করেছে। মা এই কথা বাবাকে জানাল না। বাবার শরীর ভাল যাচেছনা। বাবা পৌরসভায় কাজ করে। তার মাইনা অল্প, খরচ অনেক, তাই রাত্রে বাড়ি বসে একটা খবরের কাগজের জন্য দুই-তিন ঘন্টা ঠিকানা লেখার কাজ ধরেছে। পরিশ্রম বেড়ে গেছে, শরীর আরও খারাপ হতে লাগল। আজ সন্ধ্যা সাতটার পরে বাবা পৌরসভা থেকে ফিরে এল । বাবা খুব ক্লান্ত। জিজ্ঞাসা করল, স্বপন কোথায়?

- গাছ তলায়। ভাই-বোনকে পড়াচেছ। নাও, তোমাকে চা দিচিছ।
- শুনেছি সবাই পরীক্ষার ফল পেয়েছে, স্বপন পায়নি?
- পেয়েছে। কাগজটা খুঁজে নিয়ে আসি। পরীক্ষা খুব ভাল হয়নি।
- ঐ ছেলেটার কি হয়েছে বুঝতে পারছি না। গত বছর আমি সবার সামনে গর্ব করতাম, আর এখন মুখ দেখাতে পারছি না।
- দুঃখ করনা, আমার সোনার ছেলে ঠিক হয়ে যাবে, একটু ধৈর্য ধর।
- তাই বলে সে ক্লাসে ঘুমিয়ে পড়বে আর আমি চুপ করে থাকব? স্বপন, তুমি নাকি ক্লাসের সময় ঘুমিয়ে পড়? তোমার লজ্জা করে না?
- আর হবে না বাবা।
- আমি তোমাদের জন্য দিন রাত কাজ করে মরি, আর তুমি গাধা হয়ে যাবে?...। তুমি আমার সব আশা ভরসা মাটি করে দিলে!

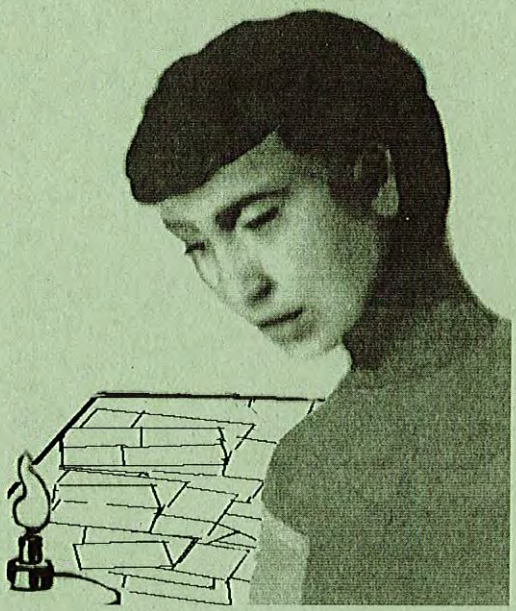


বেশ কিছুদিন বাবার মুখ অন্ধকার হয়ে রইল। কিন্তু একদিন সকালে বাবাকে দেখে স্বপন অবাক হয়ে গেল। তার মুখে রাগ বা দুঃখের কোন চিহ্ন

নেই। মায়ের মুখে হাসি। নাস্তা খেতে গিয়ে দেখল, তার থালায় রুটির বদলে দুটো পরটা। সে কিছু বুঝতে পারলনা। মা খুব হিসাবী, উৎসবের সময়ও এত ব্যয় করেনা।

রাত্রে বাবা, মা, ছেলেমেয়েরা ভাত খেতে যাচ্ছিল, এমন সময়...

- স্বপন, এই নাও, তোমার জন্য এই নতুন জামা এনেছি।
- ও... বাবা! কি সুন্দর!
- গত ছয় মাস ধরে তুমি রাত্রে উঠে ঐ সব ঠিকানা লিখেছ। আমি বুঝতে পারিনি। তোমার হাতের লেখা আমার হাতের লেখার মত। গত রাত্রে কিন্তু আমি টের পেয়েছি। তুমি যখন লিখছিলে তখন আমি তোমার পিছনে ছিলাম। পুরো দুই ঘন্টা দাঁড়িয়ে ছিলাম।



- বাবা, আমি...
- তুমি চুপ কর! দুই ঘন্টা ধরে আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম যে তোমার মত ছেলে আমার আছে। আজ সারা দিন অফিসে বসে বন্ধুদের কাছে তোমাকে নিয়ে গর্ব করেছি..... এবার কিন্তু শুন...যদি আবার কোন দিন ঐ কাজ করতে যাও...তোমার ভাল হবে না বলে দিচ্ছি..... বাবার কথা শেষ হলনা, তার গলা জড়িয়ে গেল, চোখে পানি আসল। এদিকে যখন ছোট বোন এসে স্বপনকে আলিঙ্গন করল,তখন তার চোখ দিয়ে ঝর্নার মত পানি পড়তে লাগল। চার পাঁচ মাস বকুনি তিরষ্কার খেয়ে যত দুঃখ তার বুকে জমা ছিল তা পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব ধুয়ে মুছে আনন্দের বন্যায় পরিনত হল।

২৩৮। বাঘের গোঁফ।



এক রাজপুত্র ছিল। একদিন তার মা মারা গেল। তখন তার বয়স ছয় বছর। রাজপুত্র তার মাকে খুব ভালবাসত। মা ফিরবে না, এমন কথা সে বিশ্বাস করতে পারে না । রাতে বাবা তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, এখন ঘুমাও বাবা। তখন সে জিজ্ঞাসা করে, মা কবে আসবে? সারা বছর একই প্রশ্ন।

তখন রাজা আবার বিয়ে করল। একদিন মায়ের মত সুন্দরী এক মহিলা বাড়িতে এল। বলল, মা আর কোন দিন ফিরবে না। সে আমাকে পাঠিয়েছে তোমার মা হবার জন্য। কিন্তু রাজপুত্র তার দিকে ফিরেও তাকায় না। বাবা হাতে করে ভাত না দিলে সে ভাত খায় না। সৎ মা খুব দুঃখ পায়। সে তার মন জয় করতে চেষ্টা করে। কোন ফল হয় না।

একদিন রানী এক বিখ্যাত ঋষীর খবর শুনতে পেল। সে নাকি বনের পাশে এক গুহাতে বাস করে। তার মত জ্ঞানের কথা কেউ বলে না। রানী তার কাছে গেল। জিজ্ঞাসা করল, কেমন করে রাজপুত্রের মন জয় করতে পারব? ঋষী বলল, এই জ্ঞান আমি বিনা মূল্যে দিতে পারব না। রানী বলল, কি মূল্য দিতে হবে তাই বলুন, আমি দেব। ঋষী বলল, আমার গুহার পাশের গুহাতে একটা বাঘ আছে। তার গোঁফের তিনটে লোম আমাকে এনে দিতে হবে।

রানী ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরে গেল। কেমন করে বাঘটাকে পোষ মানানো যায়? কি দিলে তার বন্ধুত্ব লাভ করা যাবে? বাঘ কি পছন্দ করে? রানী অনেকের কাছে সে কথা জিজ্ঞাসা করল। সকলে উত্তর দিল, বাঘ মাংস খেতে পছন্দ করে।



পরের দিন রানী বড় এক টুকরো মাংস নিয়ে বাঘের গুহার দিকে গেল। থামল অনেক দূরে। মাংস রেখে চলে এল। তার খুব ভয় করছিল। পরের দিন গিয়ে দেখে, বাঘ তার মাংস খেয়ে ফেলেছে। এবার আর একটু কাছে গিয়ে মাংস রেখে চলে এল। পরের দিন আরও কাছে গিয়ে মাংসটা গুহার মুখে রেখে এল। শেষে মাংস বাঘের মুখের সামনে তুলে ধরল। তারপর একদিন তার গায়ে হাত দিল। আরও কয়েক দিন গেল, তারপর হঠাৎ রানী বাঘের একটা লোম ধরে ছিড়ে নিল। বাঘ কিছু বলল না।

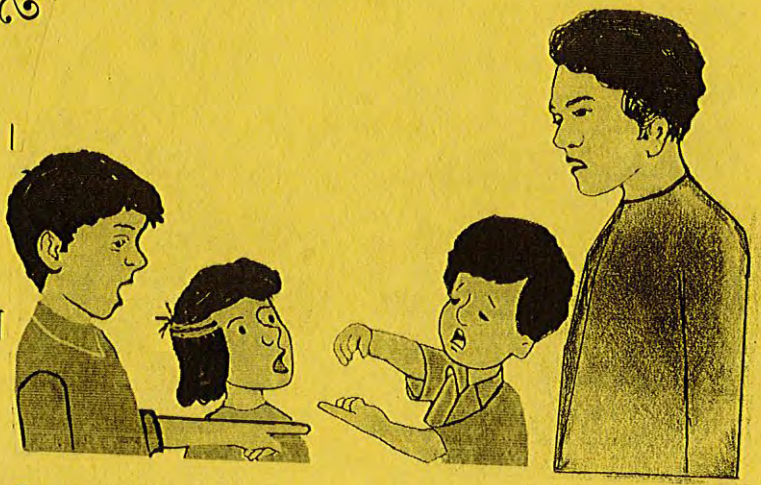
এই ভাবে তিনটে লোম ছিড়ে নিয়ে রানী ঋষীর কাছে ফিরে এল। বলল, এই নেন, আপনি যা চেয়েছেন তাই এনেছি। এবার আপনার পরামর্শ দেন। ঋষী বলল, রানী, আপনি যা করেছেন, তারপরে আপনাকে আর কোন পরামর্শ দেয়া লাগে না। আপনি সব জানেন।

২৩৯। স্বর্গ ও নরক।



তিনজন ছেলেমেয়ে ছিল। বড়জনের নাম সাগর, সে খুব রাগী, তবে মন্দ নয়। মেজ জনের নাম বাবলু, সে খুব চালাক। ছোটজনের নাম নীলা, সে খুব নরম, সামান্য দুঃখ পেলেই কাঁদত। তাদের মধ্যে রোজ ঝগড়া হত। আজ সাগর একটা কাঁচা আম কুড়িয়ে খেয়েছে। ঝগড়া শুরু হল। বড় ভাই কেন পেটুকের মত সমস্ত আম খায়? ঝগড়া শেষ হতে আধা ঘন্টা লেগে গেল। রাতে বাবা কাজ থেকে ফিরে এলে মা নালিশ করল, তোমার ছেলেমেয়েরা দিন দিন স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছে, আমি ওদের সঙ্গে আর পারছি না। বাবা সান্তনা দিল, ভয় নেই, ঠিক হয়ে যাবে।

পরের দিন ছুটি। এক সময় তারা তিনজনে লিচু গাছে উঠল, তারপরে লিচু ভাগ করার সময় ভুলে গেল, বাবা বাড়ি আছে। ঝগড়া শুরু হল। বাবা এসেও তাদের থামাতে পারছিল না। শেষে মুখ কালো করে বাজারে গেল। ফিরে এল এক কেজি রসগোল্লা ও তিনটে লম্বা চামচ নিয়ে। দুপুরে খাবার সময় ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞেস করল, ভাত খাবে, না রসগোল্লা খাবে? তিনজনই উত্তর দিল, রসগোল্লা খাব। বাবা বলল, এই চামচ দিয়ে খেতে হবে। তোমরা কি রাজী? তারা বলল,



রাজী। বাবা প্রত্যেকের হাতে চামচের ডাটি বেঁধে দিল। তারপর বলল, শুরু কর, তোমরা রসগোল্লা খাবে, আমরা দুজন ভাত খাব। বাবলু সঙ্গে সঙ্গে একটা রসগোল্লা তুলে নিল, তারপর সাগর, তারপর নীলা। কিন্তু কেউ মুখে দিতে পারল না। চামচের ডাটি এত লম্বা যে, তারা রসগোল্লা কোন মতেই মুখের কাছে আনতে পারছিল না। প্রথমে তারা হাসল। তারপরে নীলা কাঁদতে শুরু করল, তারপর বাবলু, তারপর সাগরও। এইভাবে পনের মিনিট কেটে গেল। তারপর হঠাৎ সাগর টেবিলের ওপাশে চেয়ে দেখল। তার ছোট বোনের চোখ দিয়ে পানি ঝরছে।



তখন সে নিজের কথা ভুলে গেল। চামচ ছোট বোনের মুখে তুলে বলল, নাও, তুমি খাও। হঠাৎ সকলের কান্না থেমে গেল। নীলা বাবলুকে তার রসগোল্লা খেতে দিল।



বাবলু তার রসগোল্লা সাগরের মুখে ধরল। এভাবে হাসতে হাসতে রসগোল্লা শেষ করল। সাগর বলল, আগে এত চেষ্টা করে একটা রসগোল্লাও খেতে পেলাম না... যখন আমার রসগোল্লা নীলাকে দিলাম, তখন হঠাৎ সবাই খেতে পেল। বাবা বলল, সাগর, গতকাল তুমি জানতে চেয়েছিলে স্বর্গ কেমন আর নরক কেমন। আজ তোমরা দুটোই দেখলে। আগে সবাই শুধু নিজের কথা ভাবছিলে, তখন নরকে ছিলে, যখন ভাইবোনের কথা মনে পড়েছে, তখন উঠলে স্বর্গে।

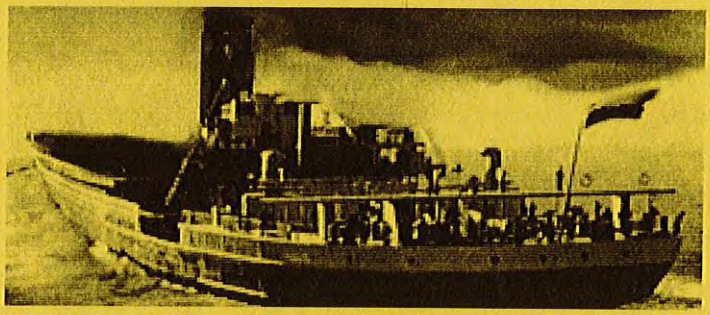


২৪০। সমুদ্র সমান হয়ে গেছে

চাং বার বছরের ছেলে, লিউ তের বছরের মেয়ে। তারা মেকং নদীর পাশে ছোট একটা কুড়ে ঘরে বাস করে। তাদের দেশে অনেক বছর ধরে দুটি দলের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। বাবা যুদ্ধে মারা গিয়েছে, কিন্তু তার দল হেরে গেছে, সুতরাং নতুন সরকার তার পরিবার ও ছেলে মেয়েকে কোন সাহায্য করেনা, তারা না কি দেশের শত্রু, রাজাকার। হঠাৎ মায়ের অসুখ হল। সরকারের ভয়ে কোন ডাক্তার তাকে চিকিৎসা করতে এল না। তখন মাও মারা গেল। এত দুঃখ-কষ্টের মাঝেও কিন্তু তারা কোন দিন নিরাশ হয়নি। লিউ মেয়েটি বাবার মত, হাসি ও আনন্দের একটা ঝর্ণা। দুঃখ-কষ্টের মাঝেও সেই ঝর্ণা কোনদিন ফুরায় নি। ছোট ভাই চাং ছিল তার উল্টো। দুঃখ পেলে তার মুখ কালো হয়ে যেত, বোন এসে তাকে শান্তনা না দেয়া পর্যন্ত ঐ ভাবে থাকত। তারা দুজনে মিলে পথে পথে ফেলানো কাগজ, ছেড়া কাপড় কুড়িয়ে বিক্রি করত। যে কয়টা টাকা পেত তাই নিয়ে বাঁচত। কিন্তু চাং অপমান সহ্য করতে পারেনা। একদিন বলল, বুবু, চল, পালিয়ে যাই, যেখানে মানুষের মত বাঁচতে পারি সেখানে যাই, বাবার এক বন্ধু আছে, সে জাহাজে পাইলটের কাজ করে, সে আমাদের উঠতে দেবে। রাত্রে চাং ও লিউ জাহাজে উঠল। পাইলট এসে তাদের কাজ বুঝিয়ে দিল। একশো লোকের রান্না করার জন্য বাবুর্চিকে সাহায্য করতে হবে। কাজের ফাকে পাইলটের সঙ্গে গল্প করে। কিন্তু একদিন আকাশ কালো হয়ে গেল, তারপর ঝড় শুরু হল। দুই ঘন্টা ধরে ভয়ানক ঢেউ জাহাজে







ধাক্কা দিতে লাগল। চাং ও লিউ পাইলটের মুখ দেখে ভয় পেয়ে গেল। ঝড় থেমে গেল, কিন্তু জাহাজ বাঁচানো গেল না। মেশিনের ঘরে পানি উঠেছিল। তখন পাইলট ক্যাপ্টেনকে বলল, জাহাজ আধা ঘন্টার মধ্যে ডুবে যাবে। প্রাণরক্ষার একটা নৌকা ঝড়ে ভেঙ্গে গেছে। বাকি নৌকাটা নামিয়ে আপনি অর্ধেক যাত্রীদের নিয়ে চলে যান। আপনি সঙ্গে না গেলে, তারাও রক্ষা পাবে না... ক্যাপ্টেনের চোখে পানি এল। তাকে আলিঙ্গন করে বলল, যাচ্ছি। বলে সে পিস্তল বার করে নিষ্ঠুর ভাবে বেছে নিতে লাগল কারা বাঁচবে আর কারা মরবে। দশ মিনিটের মধ্যে পঞ্চাশজন যাত্রী নৌকায় উঠল। ক্যাপ্টেন পাইলটকে বলল, আর একজনকে নিতে পারি, যত ছোট তত ভাল। পানিতে ফেলে দাও, সময় নেই। পাইলট দুটি ভাইবোনের দিকে তাকাল। লিউ হেসে বলল, যাও ভাইয়া, তুমি ছোট...। চাং বলল, তুমি যাও! তুমি হালকা! এই বলে আপাকে ঠেলে পানিতে ফেলে দিল। তাকে কুড়িয়ে নিয়ে ক্যাপ্টেন রওনা দিল নৌকা যেন জাহাজের সঙ্গে না ডোবে। লিউ নৌকায় বসে তাকাল তার ছোট ভাইয়ের দিকে। পাইলটের পাশে দাড়িয়ে সে হাসছিল তার দুষ্ট হাসি। লিউও তার দিকে শেষ বারের মত হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু চোখ দিয়ে এত পানি আসতে লাগল যে কিছু দেখতে পেল না। যখন আবার চোখ খুলে তাকাল তখন দেখল, জাহাজ যেখানে ছিল সেখানে সমুদ্র সমান হয়ে গেছে।



২৪১। তৈমু



তৈমু নামের অর্থ ঝর্ণা, কারণ তার হাসি একটা ঝর্ণার মত। সে বাবার কাছে বই পড়তে শিখেছে। সে দেখতে এত সুন্দর যে, তার বাবা সব সময় বলে, একদিন এক রাজপুত্র এই বনের মধ্য দিয়ে যাবে ও তোমাকে বিয়ে করতে চাইবে। তখন রাজা জানতে চাইবে, মেয়েটা কত লেখাপড়া করেছে? রাজপুত্র উত্তর দেবে, কেন, সে আমার চেয়ে বেশী লেখাপড়া জানে, সে একশটা বই পড়েছে! কিন্তু তৈমুর বার বছর বয়সে বাবা মারা গেল। এখন তৈমু কাঠের বোঝা মাথায় করে মায়ের সঙ্গে শহরে যায়।



এক দিন সে কাঠ বিক্রি করে বলল, মা, একটু থাম। সে একটা মোটা বই দেখতে পেল। ভিতরে শুধু গল্প আর গল্প। মাকে বলল, এই বইটা কিনতে হবে। আমি আস্তে আস্তে দাম শোধ করে দেব। সেদিন থেকে তৈমু প্রতি মাসে একটা-দুটো করে বই কিনে পড়তে লাগল ও তার ভাইবোনদের পড়াতে লাগল। এখন তার বয়স আঠার বছর, কাঠের বোঝা শহরে নিতে তার কষ্ট হয় না, আর যেকোন বই



পড়তেও তার কষ্ট হয় না।

একদিন বিকালে সে ঝর্ণা থেকে পানি আনতে গেল। সে সময় এক যুবক পাশের বনে একটা খরগোস শিকার করেছিল। সেটা তৈমুকে দিয়ে বলল, নাও, তোমার জন্য শিকার করেছি। তৈমু হেসে বলল, চল, মায়ের কাছে যাই।



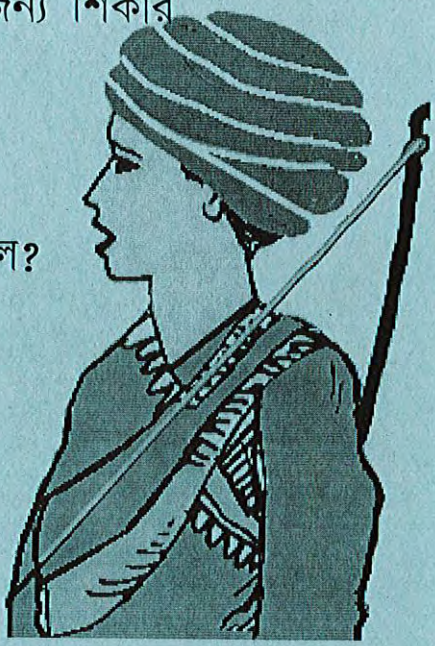
মা রাজপুত্রকে চিনে ফেলল।

- আমাদের কাছে কি জন্য এলে?

- আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।

- কেন? তার বিষয় তুমি কি জান?

- আমি সব জানি। সে কঠিন পরিশ্রম করতে পারে, সে তার ভাইবোনদের ভালবাসে ও তাদের পড়ায়, সে দোকান থেকে দু'শ বই কিনেছে। আর একটা গুণ তার আছে, তার মত সুন্দরী মেয়ে সারা দেশে আর নেই।



মা তৈমুর দিকে তাকালঃ- তোমার কি মত, মা ?

- আমি যাকে বিয়ে করব তাকে আমার ভাইবোনকে মানুষ করার ভার নিতে হবে। তুমি কি সেই ভার নিতে পার?

- পারি, আমি সেই ভার নেব, কথা দিলাম।

তৈমুর মুখে হাসি ফুটল। আর কোন প্রশ্ন করল না।

যুবকটি ভাত খেয়ে বলল, আপনারা আমাকে চেনেন না, তবে আমার বাবাকে চেনেন। তিনি এই দেশের রাজা। একদিন আমি রাজা হব, তৈমু হবে এই দেশের রানী।

২৪২। আলোর চুল



আলোর বয়স সাত বছর। সে ক্লাস টুতে পড়ে। তার কালো ঘন চুল রেশমের মত দেখতে। সবাই বলে, কি সুন্দর চুল! তবে তাকে কেউ হিংসা করে না, কারণ হাতে যা পায় সে তা বিলিয়ে দেয়, তার হাসিমুখ দেখে কেউ না হেসে পারে না। আলোর একমাত্র খেলনা হল তার চুল। প্রতিদিন চুল সাজাবার একটা নতুন কায়দা আবিস্কার করে। বেনি বাঁধে, বেনি খোলে, খোপা বাঁধে, খোপা খোলে, নেচে নেচে চুল উড়ায়, চুল দিয়ে মুখ ঢেকে রাখে, আরো কত কি... কিন্তু একদিন তার অসুখ হল। আলো আর স্কুলে আসতে পারল না। হাসপাতালে ডাক্তার ছয় মাস ধরে ওষুধ দিতে লাগল। তার মুখ ফেকাসে হয়ে গেল, তার মাথার সব চুল পড়ে গেল। মাথাটা মরা মানুষের খুলির মত দেখাচিছল। একদিন ডাক্তার বলল, তুমি ভাল হয়ে গেছ, বাড়ি যেতে পার। আলো বাড়ি ফিরে গেল, কিন্তু স্কুলে যেতে চায় না, তার লজ্জা করে। তার ক্লাসের ছেলেমেয়েরা একদিন তাকে একটা চিঠি লিখে দিলঃ- প্রিয় আলো, তুমি স্কুলে না আসলে আমরা দুঃখ পাব। তোমার চুল থাক আর নাই বা থাক, আমরা কিন্তু তোমাকে দেখতে চাই। আলো চিঠিটা পেয়ে খুশি হল। খুব চিন্তা



করল, শেষে উত্তর দিলঃ- প্রিয় বন্ধুরা, তোমাদের কাছ থেকে দুরে থাকতে আমারও দুঃখ হয়, কিন্তু আমার চুল না উঠা পর্যন্ত আমি রাস্তায় বের হতে পারব না। দুই দিন পরে ক্লাস টু'র আপা তার বাড়ীতে এল। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা চাঁদা তুলে একটা সুন্দর ওড়না কিনেছিল, আপা সে ওড়নাটা আলোর মাথায় জড়িয়ে একটা পাগড়ী তৈরি করে দিল। তারপর ওকে আয়নার সামনে এনে বলল, এই দেখ তোমাকে কত সুন্দর দেখাচ্ছে।

পরের দিন আলো স্কুলে গেল। সব ছেলেমেয়েরা তাকে একটা করে উপহার দিল। কেউ দিল মাটির পুতুল, কেউ বাদামভাজা, কেউ হাতের চুড়ি, কেউ আংটি, কেউ কলম, ইত্যাদি। সবার শেষে এল সালমা, তার হাতে কিছু নেই। আপা জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি দেবে সালমা? সালমা তার বেগ খুলে বের করল একটা লম্বা কালো চুলের বেনি। সবাই অবাক হয়ে চেয়ে রইল! হঠাৎ সবাই লক্ষ্য করল সালমার মাথায় একটা পাগড়ী আছে, আলোর পাগড়ীর মত। সালমা পাগড়ীটা খুলে ফেলল। তার মাথা ডিমের মত সাদা, পরিস্কার। সালমা আলোকে বলল, তোমার চুল আর আমার চুল একসঙ্গে বেড়ে উঠবে। আমাদের দুটি মাথা একই রকম, তাই তোমার আর লজ্জা করবে না। সবাই চুপ করে রইল। তারপর আলো সালমাকে আলিঙ্গন করতে গেল। সবাই অনেকক্ষণ হাততালি দিয়ে তাদের কান ফাটিয়ে দিল।



২৪৩। বারোটা নাড়ু

বাবলু মামার বাড়ী এসে চুরি করে নাড়ু খাচ্ছে । ঠিক সে সময় মামা ডাক দেয়। বাবলুর মুখ নাড়ু ভর্তি, উত্তর দিতে পারছে না। মামা বার বার ডাকে, শেষে বাবলু ঘর থেকে বের হয়। মুখ এখনও নাড়ু বোঝাই। আগে এলে না কেন, বদমাইশ?



- মামা, আমি...একটু পানি খাচ্ছিলাম।
- পানি না ছাই? দাড়াও, মজা দেখাচ্ছি।
- নানা ঘরে বসে ছিল, সে সব বুঝে ফেলল। মামা বাবলুকে মারতে যাচ্ছিল, তখন নানা বলল, আমার বাবুকে ছেড়ে দাও তো, আমার একটা কাজ আছে, সে আমাকে সাহায্য করবে।
- বাবলু বেঁচে গেল। জিজ্ঞাস করল, কি কাজ?
- ইঁদুর আমাদের ধান খেয়ে ফেলছে, আমি ইঁদুর মারার জন্য নাড়ু তৈরি করতে বলেছি। চল ইঁদুরের গর্ত খুঁজি।
- বাবলু জিজ্ঞাসা করে, নাড়ুতে কি আছে?
- কেন, ইঁদুর মারার বিষ আছে। বাবলুর মুখ সাদা হয়ে গেল।
- আচ্ছা নানা, মানুষ যদি একটা নাড়ু খায় তাহলে কি হয়?
- তার পেটে খুব ব্যাথা হয়, আর তিন দিন পায়খানা করে।

• আর যদি কেউ বারটা খায়, তাহলে কি হয়?

• তুই একটা বোকা ছেলে, বারটা নাড়ু কেউ খায় না কি!

• কিন্তু যদি খায়, তাহলে কি হবে?

• তাহলে তো রক্ষা নেই, তিন ঘন্টার বেশি বাঁচবে না।

• নানা, তাহলে আমি মরে যাব...! আমি বারটা নাড়ু খেয়েছি.....।

মামা দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাল, হাসি ঠেকাতে পারছিল না।





• সত্যি নানা, আমি বারটা নাড়ু খেয়েছি, আমি মরে যাব!

• সর্বনাশ! কি বললে? বারটা নাড়ু খেয়েছ! আরে কে আছিস, আমার বাবুকে বাঁচাতে হবে। এখনই বিষ নামানোর ওষুধ নিয়ে এসো। এই বলে সে চোখের ইশারা দিয়ে মামাকে কি যেন বুঝাল। পনের মিনিট পর বাবলু তার ওষুধ খেল, এক গ্লাস নিম পাতার রস। তার খুব বমী হল। যত নাড়ু খেয়েছিল সব বেড়িয়ে আসল। শুধু কি তাই! রাত্রে কিছুই খেল না, ওষুধ খাওয়ার পর নাকি চব্বিশ ঘন্টা শুধু পানি খেতে হয়। বাবলু না খেয়ে খুব কষ্ট পাচ্ছিল, কিন্তু সব সহ্য করল। শেষে মামীর মায়া হল, বলল, চল বাবলু, আমি তোমার জন্য নাড়ু তৈরি করেছি। এবার নাড়ুতে বিষ নেই।

• না মামী, জীবনে আর কোন দিন নাড়ু খাব না, মরে গেলেও না।

২৪৪। সুনীল ও তার বাবা

লাল্টু কর্মকার ছয় ফুট লম্বা মানুষ, যত লম্বা তত বলবান। যখন রাস্তায় বের হয় তখন সবাই তার দিকে তাকায়। লাল্টু কর্মকার কাঁচি, দা, কোদাল ও লাঙ্গল এত সুন্দর করে বানাতে পারে যে, গ্রামের সবাই তার কাছে আসে। যখন কাজ থাকে না তখন ঢাকায় কাজ করতে যায়। এই বছরে ঢাকায় গিয়ে তার অসুখ হল। তাকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হল। সেখান থেকে লাল্টু বাড়ীতে চিঠি লিখলঃ "সুনীলকে পাঠিয়ে দাও, আমি আছি সদর হাসপাতালে। ইতি, লাল্টু"

সুনীলের বয়স তের বছর। সে গাড়ি থেকে নেমে রিক্সায় করে হাসপাতালে গেল। নার্সদের বলল, আমি বাবাকে দেখতে এলাম। তার নাম মনিন্দ্রলাল কর্মকার , সবাই তাকে লাল্টু বলে ডাকে।





• আমাদের খাতায় মনিন্দ্রলাল বলে একজন আছে, সে পাঁচ দিন আগে ভর্তি হয়েছে। সে কথা বলতে পারে না, মুখে টিউমার হয়েছে।

• কি হয়েছে...? কোথায় আছে? আমি দেখতে যাব।

• তিনতলায় আছে, ৪৫ নম্বর সিটে। ঐ সিড়ি বেয়ে যাও।

সুনীল তিনতলায় উঠল ও ৪৫ নম্বর সিট খুঁজল। তার ভয় বাড়তে লাগল। এই ঘরে যারা শুয়ে আছে তাদের চেহারা মরা মানুষের মত। ৪৫ নম্বর সিটে একটা মানুষ পড়ে ছিল, তার মুখ সাদা ব্যান্ডেজ দিয়ে ঢাকা, তার চোখ বন্ধ, চোখের পাতা লাল। সুনীল চোখের পানিতে বিছানা ভাসিয়ে দিতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে তার হাত চেপে ধরে

ডাকতে লাগল, বাবা...বাবা...বাবা... কোন সাড়া-শব্দ নেই। রাত্রে ক্লান্ত হয়ে একটা পাটির উপরে মরার মত শুয়ে পড়ল। এই ভাবে এক সপ্তা কেটে গেল।



সুনীল বাবার পাশে বসে শুধু তার হাত ধরে থাকত, তাকে মায়ের কথা বলত, ভাই বোনের কথা, স্কুলের কথা। সময় সময় বাবা সুনীলের হাতে চাপ দেয়, এ ছাড়া সে নড়ে না, চড়ে না, বেঁচে আছে কি না তা বুঝবার উপায় নেই। একদিন ডাক্তার বলল, তুমি না থাকলে বাবা অনেক আগে মারা যেত। তোমার মত ছেলে আমার হলে সুখী হতাম। এমন সময় সুনীলের কানে ভেসে এল একটা গভীর পরিচিত সুর। ছয় ফুট লম্বা একটি মানুষ ঘরে এসে চারিদিকে খুঁজছিল। সুনীল চিৎকার করে উঠল, বাবা!... তারপর দৌড়ে গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরল!

• বাবা, ওরা আমাকে ভুল সিট দেখিয়েছে কেন?। আমি সারা সপ্তা ওর পাশে বসে কেঁদেছি বাবা!

• আচছা, আমি সুস্থ হয়ে গেছি। এবার চল সুনীল, বাড়ি যাই।

• বাবা...এই লোকটি একা মরে যাচ্ছে... তুমি যাও, আমি পরে আসব। আরও তিন দিন সুনীল সেই অচেনা মানুষের কাছে থেকে গেল। চতুর্থ দিন ভোরে যখন সুনীল তার হাত ধরল তখন সে অনেক্ষন



সুনীলের হাত চেপে রাখল, তারপরে আস্তে আস্তে হাতটা ঢিলা হয়ে গেল। সুনীল তার বুকে কান দিয়ে আর কোন শব্দ পেল না। তখন তার বুকের উপর মাথা রেখে কাঁদতে লাগল। সারা রাত এই লোকটি প্রাণ ধরে রেখেছিল, ছেলেটার হাতের ছোয়া না পাওয়া পর্যন্ত মরতে চায়নি!।

২৪৫। অপুর দুঃখ

অপুর বাবা খুব ভাল কাঠমিস্ত্রী। তার অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে, তাদের মধ্যে দুই একজন খুব খারাপ। তারা মদ খায়, তাকেও মদ খেতে দেয়। একদিন অপুর বাবা মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরল। তারপর ঘন ঘন মাতাল হয়ে ফিরতে শুরু করল। তখন অপুর বয়স দশ বছর। স্কুলের পর বাবা কাজের জন্য ডাকে, রান্দা টানতে না পারলে মারে। রাত নয়টার সময় অপু কারখানা থেকে বেড়িয়ে আসে। তখন বই খাতার উপর ঘুমিয়ে পড়ে। সময় সময় রাত্রে খাবার জোটে না, বাবা মদ খেয়ে টাকা উড়িয়ে দেয়। মা অপুর ছেড়া কাপড় সেলাই করে আর পারে না। একদিন অপু বাবার কাছে নতুন জামা চাইতে গেল। এমন একটা চড় খেল যে, তার চিহ্ন অনেক দিন থেকে গেল।



গত বছর অপু খুব ভাল ছাত্র ছিল, এই বছরে হয়ত পাস করতে পারবে না। একদিন স্যার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এল, মা সব কিছু বলে দিল। পরের দিন মাসিক পরীক্ষা। অপু রচনা লিখতে শুরু করল। রচনার নাম ছিলঃ- আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ। অপুকে চিন্তা করতে হল না। সঙ্গে সঙ্গে লিখতে শুরু করলঃ- "আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ হল যখন বাবা অন্য রকম হয়ে গেছে। একদিন বাড়ি ফিরে এল, তার চেহারা ছিল অন্য রকম। মা জিজ্ঞাসা করল, চাউল এনেছ? তখন হঠাৎ তার চোখ লাল হয়ে গেল ও মাকে মারতে শুরু করল । সেদিন থেকে আমার দুঃখ এত বেশি যে চোখ থেকে পানি বের হতে চায় না, কারণ বাবা আর আমাকে ভালবাসে না, মাকেও ভালবাসে না, কাউকে ভালবাসে না। সেদিন থেকে আমি আর কোনদিন হাসতে পারিনি, কাঁদতেও পারিনি, কারণ আমার বাবা অন্য

রকম হয়ে গেছে, আগের মত আর হবে না। এটা হল আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ।"

পরের দিন স্কুলের শেষে হেডমাষ্টার সাহেব সব ছাত্রদের লাইন করে দাঁড়াতে বলল। বলল তোমাদের পরীক্ষার কাগজ দেখে আমি খুব খুশি হলাম। তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর রচনা লিখেছে অপু কর্মকার, তার জন্য আমি এই সুন্দর গল্পের বই কিনে এনেছি। চল আমরা সবাই মিলে তাকে বাড়ি পোঁছে দিই ও তার বাবাকে এই খবর দিয়ে আসি।

ছাত্ররা অপুর দুঃখের কথা জানত। সবাই হাততালি দিল। তারপর হেডমাষ্টারের সঙ্গে অপুর বাবার কারখানায় গেল। অপুর বাবা অবাক। স্যার বলল, অপু পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছে, তাকে নিয়ে আপনি গর্ব করতে পারেন। এই হল তার পুরষ্কার।





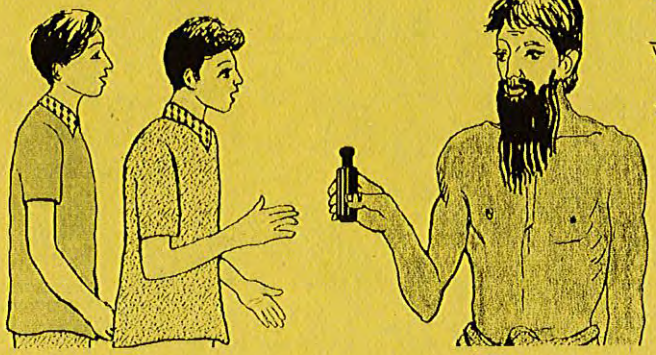
অপুর বাবা পাথরের মুর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। গত সপ্তাহ মাতাল হয়ে সে অপুর মুখে যে চড় মেরেছিল এখনও তার দাগ দেখা যাচ্ছিল। সবাই চলে গেলে অপুকে বলল, যাও, মাকে খবরটা দিয়ে এসো। তারপর কারখানার ভিতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। বসে বসে বইটা খুলে দেখল। সামনে অপুর নাম লেখা, ভিতরে অপুর পরীক্ষার কাগজ। সে অপুর পরীক্ষার কাগজ পড়তে লাগল। তারপর তিন ঘন্টা ধরে কারখানার ভিতরে বসে কি করল তা কেউ জানেনা, কিন্তু সেদিন থেকে অপুর মুখে আর কোন দাগ পড়েনি, তার মুখে হাসি ফিরে এল, তার বাড়িতেও আনন্দ ফিরে এল।

২৪৬। ভূতের বাচ্চা।



আবুর দুঃখের সীমা নেই। এই মাসে খুব গরম পড়েছে। আম-কাঁঠাল অনেক আগে পেকে গেছে। ছুটির সময়ে মামার বাড়িতে গেলে আর কিছু পাওয়া যাবে না। এখন ছুটি হলে সব ঠিক হয়ে যেত। কিন্তু হেডমাস্টার সাহেব কিছু বুঝতে চায় না, ছুটির কথা বললে হাসে। এ ছাড়া ফুটবল খেলায় আবুর দল তিন বার হেরে গেছে। সবাই তাদের ঠাট্টা করে । তার উপরে এখন বাবা-মা বলেছে বুবুকে বিয়ে দেবে। বুবুর সঙ্গে তার খুব ভাব, বুবুকে সে ছাড়তে চায় না।

আবু এসব কথা ভাবছে, এমন সময় হোসেন তার কাছে এল। এই দেখ, এই কালো শিশি যোগাড় করেছি। ফকির বাবা বলেছে শিশিটা কালো না হলে ভূতের বাচ্চা তার ভিতরে বাঁচতে পারবে না। চল ফকির বাবার বাসায় যাই। ফকির বাবার লম্বা দাড়ি। তিনি কালো শিশিতে ভূতের বাচচাকে দিয়ে বললেন, নাও, জোনাকির আলো খাওয়াতে হবে, সপ্তায় এক বার।



তারা বাড়ি গেল। ফুটবল খেলা হবে চারটায়। তার ভূতের বাচ্চাকে মাজায় বেঁধে যখন আবু মাঠে নেমে গেল, তখন সবাই বুঝল আজ কারা জিতবে। বিরোধী দলের ক্যাপ্টেন খেলার শুরুতে হোঁচট খেয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে খেলতে লাগল। আবুর দল এক ঘন্টার মধ্যে দশটা গোল দিল।

পরের দিন কিন্তু গরমের ছুটি না পেলে সর্বনাশ হবে। ছাত্ররা আবার দরখাস্ত করল। হেডমাস্টার সাহেব দরখাস্ত ছিড়ে ফেললেন। কিন্তু চারটার দিকে ঝড় এসে স্কুলঘরের চাল উড়িয়ে নিয়ে গেল। তখন টি,ও সাহেব হেডমাস্টারকে বললেন, স্কুল মেরামত করতে হবে, ছুটি দিন। দুঃখের বিষয়, বুবু মামার বাড়ি যাবে না। বর তাকে দেখতে আসবে। বুবু বরকে চেনে। ছেলেটা বোকা, দেখতেও ভাল না। আবু বলল, তুমি কিছু ভেবো না, আমি এই বিয়েটা ভেঙ্গে দিচ্ছি।



পরের দিন বর এল। বুবু কিন্তু বানরের মত ব্যঙ্গাতে লাগল, তাকে খুব বিশ্রী দেখাল। বর পক্ষ বলল, আর এক দিন আসব। তখন বুবুকে নিয়ে আবু গেল মামার বাড়ি। মামার বাড়ি থেকে দুই ভাইবোন পনের দিন পর ফিরে এল। পথে বুবু বলল, চল, ফকির বাবাকে এই কাঁঠালটা দিয়ে আসি। তিনি তো আমাদের অনেক উপকার করেছেন। তারা গিয়ে দেখে, একটা লোক বাগানে লাল সাকের বীজ বুনছে। আবু বলল, আপনার কি হল? এখন আর ধ্যান করেন না...?



লোকটি বলল, থাক ওসব কথা! আগে পাগল ছিলাম, তুমি বুঝতে পারনি? পাগল না হলে কেউ ভূতের বাচ্চা বিলি করে দেয়? কই, তোমার শিশিটা দাও তো? ফকির বাবা ঢাকনিটা খুলে দিল ও শিশিটা উপুড় করে বলল, এই দেখ, শিশিটা খালি...। অপু কেঁদে ফেলল।

২৪৭। সত্যিকার বন্ধু

শংকর ক্লাস ফোরে পড়ে। কেউ পারে না তার মত বল খেলতে, দৌঁড়াতে, গাছে উঠতে ও নৌকা বাইতে। তার এক বন্ধু আছে, রফিক তার নাম । সেও ক্লাস ফোরে পড়ে। তাদের দু'জনের বাবা এক নৌকায় নদীতে মাছ ধরে । মাছ বেশী ধরা পড়লে একসঙ্গে আনন্দ করে, ধরা না পড়লে একসঙ্গে দুঃখ করে ও বাড়িতে না খেয়ে থাকে।



রফিক অঙ্কে সব সময় বেশী নম্বর পায়, তাই সমবায়ের টাকা রাখে। একদিন সর্বনাশ হয়ে গেল। রফিক গিয়ে দেখল বটগাছের সেই ফাকে কৌটা নেই। তাতে ১০১ টাকা ছিল। স্যার জিজ্ঞেস করল, তুমি ছাড়া টাকার জায়গা কে জানত? রফিক বলল, কেউ না।

সবাই ভাবল রফিক সমবায়ের টাকা চুরি করেছে। সেদিন থেকে কেউ তার সঙ্গে খেলে না, কেউ কথা বলে না। রফিক সহ্য করতে পারে না, স্কুল কামাই করে। তখন শংকর মাকে বলল, মা, আমাকে একশ টাকা দাও। পরের দিন ক্লাশের মধ্যে হাত তুলে বলল, স্যার, আমি সমবায়ের টাকা নিয়েছি, এই নিন ১০১ টাকা। সেদিন থেকে সকলে রফিকের সঙ্গে আবার খেলতে শুরু করল। শংকরের সঙ্গে আর কেউ খেলে না। সে দূরে গিয়ে একা একা ডাংগুলি খেলে। এই ভাবে দু'মাস কেটে গেল। একদিন ক্লাশ ফোরের এক ছাত্র, বাজি ধরল নারিকেল গাছে উঠবে।সে গাছে উঠল, কিন্তু নীচের দিকে

তাকিয়ে ভয় পেল। নেমে আসার সাহস পায় না। সব ছেলেমেয়ে তার দিকে চেয়ে আছে।

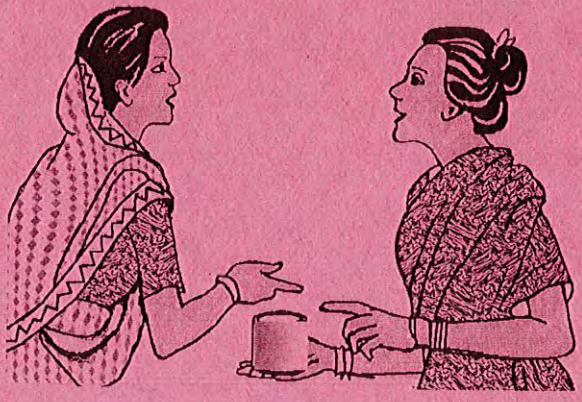


তখন রফিক দৌড়ে গিয়ে শংকরকে ডেকে নিয়ে আসল। শংকর স্যারের চাদরটা চেয়ে নিয়ে চোখের পলকে গাছে উঠল। ছেলেটার পাশে এসে চাদরটা তার কোমরে বেঁধে বলল, আমি ধরছি, আর ভয় নেই। ছেলেটা বেঁচে গেল।

রাত্রে ছেলেটার মা তাকে জিজ্ঞেস করল,

- শংকর কি সত্যি টাকা চুরি করেছিল?
- না মা, শংকর তার বন্ধুকে বাঁচাবার জন্য টাকা শোধ করেছে, টাকা ওর মা দিয়েছিল।
- তাহলে কি রফিক চুরি করেছে?
- না মা, রফিকও টাকা চুরি করে নি। কেউ চুরি করেনি। এই দেখ, টাকা আমার কাছে। এক পয়সাও খরচ করিনি।

মা তখনই শংকরের মায়ের কাছে গেল। বলল, দিদি, এই নাও তোমার একশো টাকা। আমার ছেলে নিয়েছিল দুষ্টুমি করে। টাকা নিয়ে সে তার দোষ স্বীকার করতে সাহস পায়নি। দোয়া কর, একদিন যেন সে তোমার ছেলের মত মানুষ হয়।



২৪৮। কার শক্তি বেশী

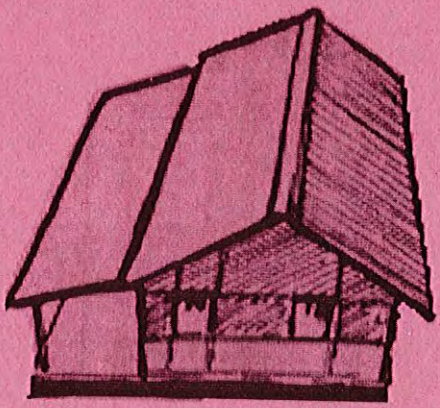


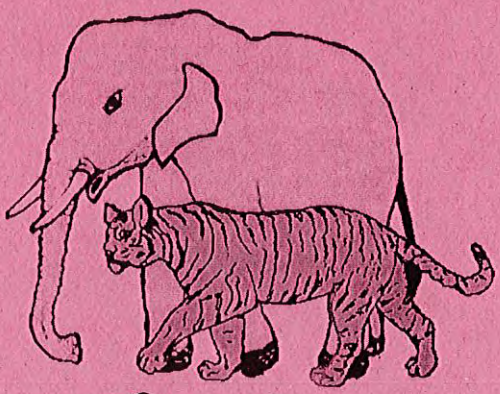
হাতি বাঘের সঙ্গে আলাপ করছিল। হাতি বলছিল, মানুষ আমার শত্রু, তারা আমাদের দাঁত পাওয়ার জন্য বন্দুক দিয়ে আমাদের মেরে ফেলে, আর না হয় আমাদের বন্দী করে ও গাধার মত খাটায়। তাদের শেষ না করা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।



বাঘ বলছিল, মানুষ আমারও শত্রু। তারা আমার জাত শেষ করে ফেলেছে। প্রাণ রক্ষা করার জন্য আমাদের গভীর জঙ্গলে থাকতে হয়। আর জঙ্গল ওরা কেটে ফেলছে। সুতরাং আমরাও বাচঁতে পারব না। আমিও যুদ্ধ করব। তাদের শেষ না করা পর্যন্ত আমারও শান্তি নেই।

এবার মাছি বলল, মানুষ তোমাদের শত্রু, তবু এখনও তোমাদের বাঁচতে দেয়। আমাদের কিন্তু সে বাঁচতেও দেয় না। দিন দিন নতুন বিষ আবিষ্কার করে, আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দেয় শুধু আমাদের মারার জন্য। আমিও তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব।





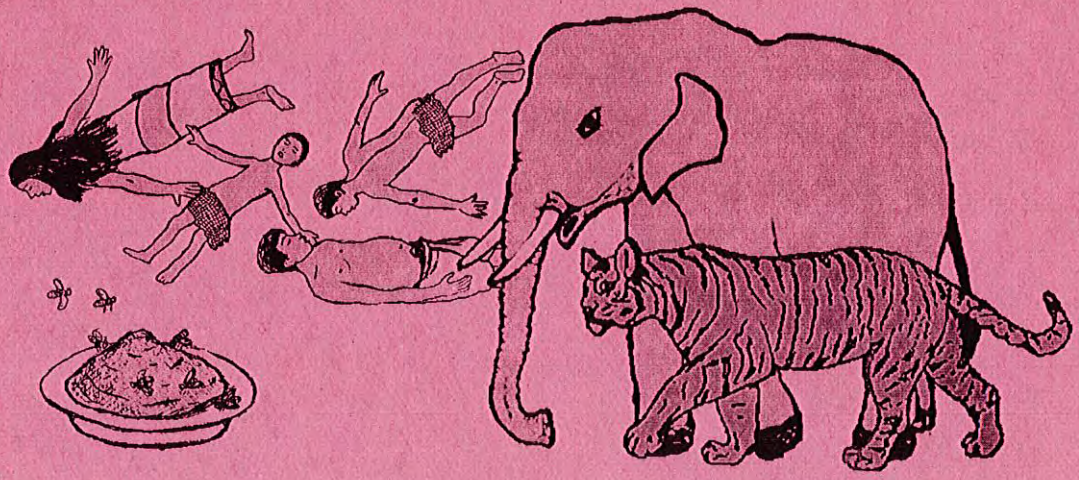
হাতি আর বাঘ হেসে বলল, দূর! ছোট মুখে বড় কথা! তুই কি নিয়ে যুদ্ধ করবি? মাছি বলল, আচ্ছা বেশ,

তিনটি গ্রাম বেছে নাও। আমরা এক একজন এক এক গ্রামে যুদ্ধ শুরু করব। হেসে হেসে বাঘ আর হাতি তিনটি গ্রাম বেছে নিল।

বাঘ সেই রাত্রে একটি গ্রামে ঢুকে পড়ল। সবাই ঘুমাচ্ছিল। এক বাড়িতে গিয়ে সবাইকে ঘাড় মটকিয়ে মেরে ফেলল। সারা গ্রামে সবাই বাঘ! বাঘ! বলে চিৎকার করতে লাগল, সড়কি ও শেল নিয়ে বের হল। পরের রাত্রে গ্রামে গ্রামে আগুন জ্বালিয়ে রাখল, পাহারা দিতে লাগল। শিকারীরা গুলি ছুড়ে বাঘটাকে গভীর জঙ্গলে তাড়িয়ে দিল।

হাতি প্রথম রাতে অনেক ঘর ভেঙ্গে চুরমার ক'রে ফেলল। যাকে পেল তাকে পিষে মেরে ফেলল। তাতে গ্রামের দশ-পনেরটি লোক মারা গেল। কিন্তু পরের দিন শিকারীরা তার পিছনে লেগে তাকেও গভীর জঙ্গলে তাড়িয়ে দিল।

এদিকে মাছি কোন শব্দ করল না। বাড়ি বাড়ি ময়লার উপর বসল। ময়লা নিয়ে ভাতের উপরে বসে রোগ জীবাণু ছড়াতে লাগল। কয়েক দিনের মধ্যে বহু লোক, ডায়েরিয়া, কলেরা ও আমাশায় মরে গেল। কেউ মাছিকে দোষ দিল না। সে চুপি চুপি রোগ জীবানু ছড়াতে লাগল। এক মাসে এত লোক মারা গেল যে, কবর খোড়ার লোক ছিল না। তখন হাতি ও বাঘ মাছিকে বলল, আসলে তুমি আমাদের ওস্তাদ!



২৪৯। ছাইমাখা

আলোমতির বয়স আঠার বছর। গ্রামের লোকেরা তার হাসিমুখ দেখার জন্য বাড়িতে আসে, দেখে তারাও হাসিমুখে ফিরে যায়। কিন্তু আলোমতির মা নেই, তার সৎ মা নিজের দুটি মেয়েকে ভালবাসে, আলোমতিকে হিংসা করে। বাজার থেকে রসগোল্লা নিয়ে আসলে তার দুটি মেয়েকে বলে, তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেল, আলোমতি যেন দেখতে না পায়। সংসারের সব কাজ সে তার উপর চাপিয়ে দেয়, তার একটা কাপড় ছাড়া আর কোন কাপড় নেই। সারাদিন সে হাসি মুখে ধুলো ছাই মেখে কাজ করে যায়, তাই সবাই তাকে ছাইমাখা বলে ডাকে।



একদিন পথে রাজদূতের ডাক শুনা গেল,

• মহারাজের নিমন্ত্রণ! মহারাজ তার পুত্রবধুকে বেছে নেবেন। দেশে যত সুন্দরী কন্যা আছে, সবাই যেন রাজপ্রাসাদে এসে দেখা করে।

রাত হয়ে গেল। ছাইমাখার দুই বোন মায়ের সঙ্গে রাজবাড়িতে গেল। ছাইমাখার কোন ভাল কাপড় নেই, তাই যেতে পারল না।

রাজপ্রাসাদ আলোতে ভরে গেছে। ছাইমাখা আর থাকতে পারল না। তার ছেঁড়া কাপড় পরে প্রাসাদের দিকে চলল। প্রাসাদের পাশে এসে, জানালা দিয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ তার দুটি চোখ রাজপুত্রের চোখের সঙ্গে মিলে গেল। রাজপুত্র অবাক হয়ে জানালার দিকে এগিয়ে এল। ছাইমাখা লজ্জায় পালিয়ে গেল। রাজপুত্র







তার পিছনে ছুটল, কিন্তু অন্ধকারে তাকে খুঁজে পেল না। পরদিনও তাকে খুঁজতে লাগল। তার খাওয়া ঘুম নেই। শেষে তার অসুখ হল। ছাইমাখা পালাবার সময় একটা স্যান্ডেল ফেলে গিয়েছিল। রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বলল, মন্ত্রীবর, তুমি মেয়েটাকে চেন?

- চিনি মহারাজ, ভিক্ষুকের মত কাপড়, রাজকন্যার মত ভাব ।
- খুঁজে দেখ। এই স্যান্ডেল তার পায়ে খাটলে যুবরাজকে খবর দাও।

দেশে যত সুন্দরী মেয়ে ছিল স্যান্ডেলটা তাদের কারও পায়ে খাটল না। শেষে মন্ত্রী ছাইমাখার বাড়ীতে এল। তার দুটি বোন দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু স্যান্ডেলটা তাদের পায়ে খাটল না। মা বলল, মন্ত্রী সাহেব, আবার খাটিয়ে দেখুন!





- না, আমি মেয়েটাকে চিনি, সে টেড়া নয়। আরে! ঐ মেয়েটা কে! এস মা, স্যান্ডেলটা পরে দেখ... বাহ্! খেটে গেছে! মা, এই কাপড় পর, যুবরাজ তোমাকে নিতে আসবেন।
- মন্ত্রী সাহেব, ঐ কাপড় আমার নয়। যুবরাজ যদি আমাকে চায়, আমি যেভাবে আছি সেই ভাবে আমাকে নিতে হবে।

যুবরাজ খবর পেয়ে সুস্থ হয়ে উঠল। ঘোড়ায় চড়ে ছুটে এল। বলল,





- কেন এতদিন লুকিয়ে ছিলে?
- আমি জানতে চেয়েছিলাম, তুমি সত্যি আমাকে ভালবাস কি না, এবার জানলাম।
- আর আমি যদি দুঃখে মরে যেতাম?
- রোজ আমি তোমার খবর নিয়েছি, আমি জানতাম তুমি মরবে না । এবার চল, যাই।

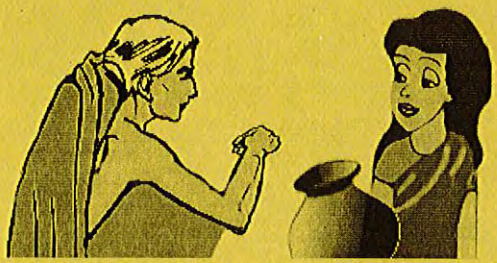
২৫০। মুক্তা আর সাপ



চাঁদের দেশে এক পরী ছিল। সে বলত, খোদা শুধু মৃত্যুর পরে পুরস্কার ও শাস্তি দেন। আমি জীবন থাকতে পুরস্কার ও শাস্তি দেব, মানুষ সঙ্গে সঙ্গে ভাল হয়ে যাবে। পরীটা বুড়ির মুখোস ও বুড়ির পোশাক পরে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এক দিন সে রাজপ্রাসাদে গেল। চাকর কাপড় কাঁচছিল। বুড়ি বলল,তোমাদের এখানে কত শান্তি!



• কয়েক বছর আগে আরও শান্তি ছিল খালাম্মা। বড় রাজকন্যার ব্যবহার নিম গাছের পাতার মত। সবাই তাকে তেতুলী বলে ডাকে। ছোট রাজকন্যা ভাল, কিন্তু আদর পায় না। ঐ যে, ঝর্ণা থেকে পানি নিয়ে আসছে, ওর নাম কমলী। একটা মিষ্টি সুর ভেসে এল, সালাম খালাম্মা। বুড়ি বলল, মা, আমাকে একটু পানি খাওয়াবে? রাজকন্যা হাসিমুখে নিজের হাতে ঢেলে পানি খেতে দিয়ে বলল, পিপাসা মিটেছে খালাম্মা ?



• হ্যাঁ মা, তোমার মত লক্ষী মেয়ে আর হয় না। তোমার হাসিতে মুক্তা ঝরে, আর তোমার মুখের কথা যেন গোলাপের পাপড়ি। কমলী ফিরে আসলে রানী রাগ করে বলল, এত দেরি কেন ?

• আমি বটগাছের তলে বসেছিলাম, এক বুড়ি পানি চেয়েছে...

• একি? মুখ থেকে পাপড়ি পড়ছে! আর এই দেখ, মুক্তা ঝরছে!

• ও!... বুড়ি তো বলেছে, আমার হাসিতে নাকি মুক্তা ঝরে!

• তাই না কি! এই যে তেঁতুলী, শুনে যাও, কাল তুমি পানি আনতে যাবে। বটগাছের তলে বসবে। বুড়ি এলে যত্ন করে পানি খাওয়াবে।

পরের দিন তেঁতুলি ঝর্ণা থেকে পানি তুলে বটগাছের তলে বসল। বুড়ি কিন্তু এল না। এক যুবতী এসে বলল, বোন, একটু পানি খাওয়াবে?

• আমি কি তোর জন্য পানি আনি? চলে যা!

• সে কি ! তোমার কথা যেন সাপের ছোবল!



তেঁতুলী রাগ করে কলসিটা ফেলে বাড়ি গেল। মা দৌড়ে এসে বলল,



• কি হল তেতুলী, মুক্তা ঝরে? তেতুলী বলল, বুড়ি আসেনি। সব ঐ শয়তান কমলীর কারসাজি!

যেই কথা বলল অমনি তার মুখ থেকে সাপ বের হতে লাগল। কমলী ভয়ে পালিয়ে গেল। মা ও মেয়ে একটা করে লাঠি নিয়ে তাকে ধাওয়া করতে লাগল। কমলী গভীর বনে এসে শান্তি পেল।সেখানে অনেকক্ষন কাঁদল, তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। হঠাৎ রাজকিয় পোষাক পরা এক যুবক তাকে জাগালঃ- রাজকুমারী, সারা দিন ধরে তোমাকে খুঁজছি, তুমি কাঁদছ কেন?

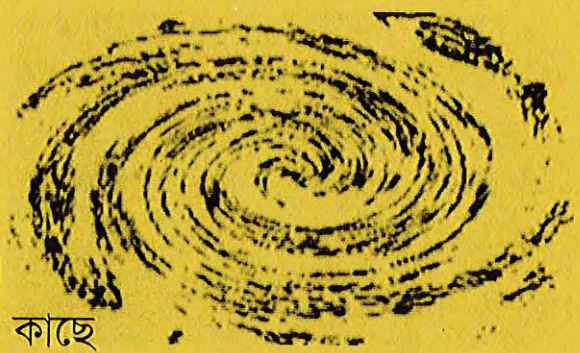


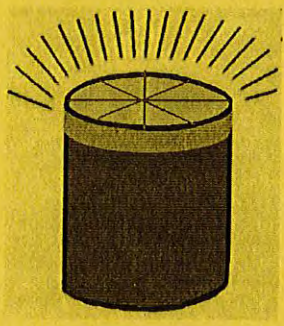
• কেউ আমাকে ভালবাসে না।

• সে কি! আমি তোমাকে ভালবাসি! আমার প্রাসাদে চল, তুমি আমার রানী হবে।

২৫১। বৈশাখ মাসের দান

গোলাম চাষীর অবস্থা খুব খারাপ। বৈশাখ মাসের শেষে, আমগাছ, কাঁঠাল গাছ, পেঁপে গাছ ও কলা গাছে ফল ধরছিল। ধানের জমিতেও ফসল হতে যাচ্ছিল। এমন সময় প্রচন্ড ঝড় এসে সব ধ্বংস করে ফেলল। গোলাম চাষী তার বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে না খেয়ে থেকে যায়। একদিন বউ বলল, এসব অত্যাচার বৈশাখ মাসের খুব অন্যায়। ক্ষতিপুরণ দেয়া উচিৎ। আমি পুরুষ মানুষ হলে কবে তার কাছে যেতাম! গোলাম চাষী ভাবল, আল্লার দয়া আছে, নইলে কি এত বুদ্ধিমতি বউ আমি পাই? তখনই সে বৈশাখের কাছে গেল। বলল,



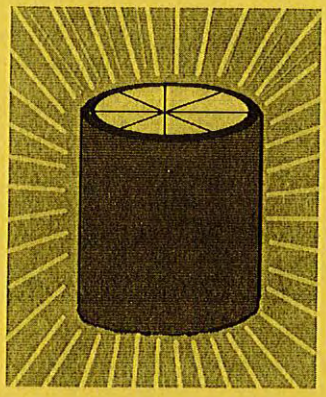


• হুজুর আপনি প্রত্যেক বছরই আমাকে মেরে চলে যান। এবার আমি মরে যাচ্ছি, মরার আগে আপনার কাছে এলাম।

• ভাই, আমাকে মাফ কর, আমি টের পাইনি। এই কৌটাটি নাও। সব সময় পকেটে রাখবে, কারো হাতে দেবে না। যখন খাবার থাকে না তখন খুলবে। বাড়ির সবাই খেতে পাবে। গোলাম চাষী বাড়ি চলে গেল। কৌটাটা খুলে, বৌ ছেলেমেয়ের সঙ্গে যা খুশি তাই খেল। বৌকে বললো, সাবধান ! কাউকে বলো না। বৌ কিছুদিন চুপ করে ছিল, কিন্তু একদিন জমিদারের বাড়িতে কাজ করতে গিয়ে কৌটার কথা বলে ফেলল। জমিদার কৌটাটা দেখতে চাইলো। কৌটাটা নিয়ে আর ফিরিয়ে দিলো না। গোলাম চাষী আবার অভাবে পড়ে গেল। তখন

আবার পাহাড়ের দিকে যাত্রা করলো। বৈশাখ মাস সব কথা শুনে বললো,

- এবার কিন্তু দোষ হল তোমার।
- আপনি ঠিক বলেছেন। তবে এবারের মত আমাকে মাপ করে দেন। আর ভুল হবে না।



বৈশাখ বলল,

- এই সোনার কৌটা নাও । খুব খিদে না পেলে এটা খুলবে না কিন্তু। গোলাম চাষী বাড়ি চলে গেল। গিয়ে দেখে চাল নেই, ডাল নেই। বৌ বলল, আমরা না খেয়ে মরে যাচ্ছি, কৌটাটা খোল।

গোলাম চাষা সোনার কৌটা খুলে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে একটা লাঠি এসে বৌএর গায়ে পড়তে লাগলো। গোলাম চাষী কৌটা বন্ধ করে বললো, জমিদার সাহেবকে বল, আমি আগের চেয়ে সুন্দর কৌটা পেয়েছি। জমিদার আবার চাষীকে ডাকলো। ডেকে কৌটাটা খুলে দিল। তখন মার খেতে খেতে বলতে লাগলো, আর না, আর না, আমি তোমার সবকিছু ফিরিয়ে দিচ্ছি! জমিদার আগের কৌটাটি ফিরিয়ে দিয়ে শান্তি পেলো। সেদিন থেকে গোলাম চাষীর অভাব মিটে গেল।



২৫২। লাল টিয়া

এক রাজা ছিল, তার দুই ছেলে ও এক মেয়ে। কিন্তু তাদের কোন ক্ষমতা ছিল না। শত্রুরা তাদের রাজ্য কেড়ে নিয়েছে ও সাগরের মাঝে ছোট এক দ্বীপে তাদের বন্দী করে রেখেছে।



একদিন এক লাল টিয়া পাহাড়ের দিকে উড়ে যাচ্ছে, দেখতে এত সুন্দর যে রাজকুমারী সেদিন থেকে শুধু তার কথা ভাবছিল। দুই রাজকুমার ছোট বোনকে খুব ভালোবাসত। বড়জন বললো, ছোট বোন, দুঃখ করো না, আমি লাল টিয়াকে খুঁজে আনবো। এই বলে সে পাহাড়ের দিকে রওনা হলো। পথে এক ঋষির সাথে তার দেখা হলো। রাজকুমার জিজ্ঞাসা করলো, লাল টিয়া কোথায় থাকে? ঋষী উত্তর দিল, লাল টিয়া থাকে পাহাড়ের চূঁড়ায়, এক প্রাসাদের মধ্যে। কিন্তু তুমি ভিতরে গিয়ে যদি কোন কথা বল তাহলে অন্যদের মত পাথর হয়ে যাবে। তুমি লাল টিয়ার একটি পালক তুলে নাও। সেইটা মুর্তিগুলোর গায়ে ছুঁয়ে দাও, তাহলে সবাই জীবিত হয়ে উঠবে। রাজকুমার প্রাসাদে প্রবেশ করে শত শত যুবক ও দৈত্যের মুর্তি দেখতে পেল। লাল টিয়া উড়ে এসে তার ঘাড়ে বসলো। বলল, তুমিও মরতে এলে? অসুবিধা নেই, তোমার বাবা তো আর কাঁদবে না, সে মারা গেছে।



সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটা উত্তর দিল, কই, একটু আগেই ভাল ছিল!

তক্ষনই সে পাথর হয়ে গেল। এক সপ্তা গেল। ছোট রাজকুমার বলল, ভাই আসছে না কেন ? আমি খুঁজে

নিয়ে আসি। সেও ঋষির কথা শুনে পাহাড়ে উঠলো ও প্রাসাদে প্রবেশ করল। হঠাৎ তার ভাইয়ের মুর্তি দেখতে পেলো। কেঁদে কেঁদে বলল, ভাই ! আমার ভাই! সঙ্গে সঙ্গে সেও পাথরের মুর্তি হয়ে গেল।

কিছুদিন পরে ছোট বোন বলল, আমার জন্য তারা বিপদে পড়েছে। সে গিয়ে ঋষির কথা খুব মন দিয়ে শুনল। তারপর পাহাড়ে উঠে প্রাসাদে প্রবেশ করল। লাল টিয়া যেই তার ঘাড়ে বসে কথা বলতে শুরু করল, সঙ্গে সঙ্গে সে তার ঠোঁট ধরে একটা ফিতা দিয়ে খুব শক্ত করে বেঁধে ফেলল। তারপর ডানা থেকে একটা পালক তুলে নিয়ে মুর্তিগুলোতে ছোঁয়াতে লাগল। যুবকরা ও দৈত্যরা জীবিত হয়ে উঠল। শেষে পালকটি লাল টিয়ার মাথায় ছুঁইয়ে দিল। অমনি লাল টিয়া এক বিরাট জাহাজে পরিণত হয়ে সমুদ্রে নেমে গেল। তখন সবাই আনন্দ করতে করতে পাহাড় থেকে নেমে রাজার কাছে এল। রাজাকে নিয়ে দৈত্য ও যুবকরা মিলে জাহাজে উঠল এবং তাদের হারানো রাজ্য উদ্ধার করার জন্য যাত্রা করল।





২৫৩। কার কত দাম

রেজার বয়স দশ বছর। দু'বছর আগে তার বাবা মারা গিয়েছে। মা পেটে-ভাতে তাকে কালু মিয়ার গরু চরাতে দিয়েছে। যাবার পথে তার দেখা হয় স্কুলের ছাত্রদের সাথে। আজ খালেক মিয়ার ছেলে তাকে একটা ধাক্কা দিয়ে বলেছে, রাখালের বাচচা, আমাদের মাঠে আসিস কি



করতে? তোর গোবর কুড়িয়ে নিয়ে যাস না কেন? রেজা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। মাঠে আলীর সাথে তার দেখা হল। সে তার দু'বছরের বড়। কাঁদতে কাঁদতে ছাত্রদের ঠাট্টার কথা বলল। আলী বলল, ছাত্রদের মত বোকা আর নেই। ওরা কি আমার মত ডাংগুলি খেলতে পারে? নাও, তোমাকেও শিখতে হবে। সেদিন থেকে রেজা ডাংগুলি শিখতে লাগল। প্রথমে শুধু ভুল করতো আর আলীর বকুনি খেত, কিন্তু পনের দিন পরে আর ভুল করল না। এখন মাঠে যাবার পথে, তারা দুজন পরস্পরের দিকে গুলি ছোড়ে ও হাত দিয়ে ধরে ফেলে। হেডমাস্টার তাদের নিপুন



খেলা দেখে অবাক হয়। আলী বাঁশি বাজায়। বলে, একদিন ঢাকার রেডিওতে বাজাব। তুমি শিখতে চাও? রেজা বলল, চাই! এবার অনেক দিন লাগল। মায়ের কাছে তিন বার বাঁশীর টাকা চাইতে হল। প্রথমে রেজা পাঁচ টাকার বাঁশী বাজাত, দু'মাস পরে দশ টাকার বাঁশী কিনে নিল।

শেষে আলী বলল, এবার বিশ টাকার বাঁশী না হলে চলবে না। রেজার মা তার বাজনা শুনে, না খেয়ে থেকে বিশ টাকা জোগাড় করে দিল। একদিন আলী বলল, এবার চল, আমার ওস্তাদের কাছে যাই। আলীর ওস্তাদ রেজাকে নিজের বাঁশী বাজাতে দিয়ে বলল, যা পার আমাকে শোনাও। রেজা বাঁশীতে ফুঁ দিল। অমনি এমন মধুর সুর বের হল যে রেজা প্রাণ ঢেলে বাজাতে লাগল। ওস্তাদ আধ ঘন্টা ধরে নিস্তব্ধ হয়ে শুনল। তার দু' চোখ ছল ছল করছিল। শেষে বলল, ওই বাঁশীটা আমার, তবে এখন তোমার কাছ থেকে ওটা ফেরত নিলে আমার পাপ হবে। ওটার দাম কিন্তু বিশ টাকা নয়, এক হাজার টাকা। রেজার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল, চোখে পানি এল। শেষে বলল, ওস্তাদ, আমি শপথ করছি একদিন বাঁশীটার দাম শোধ করব । তখন রেজার হাত থেকে ওস্তাদ একটা টাকা নিল। বাকি টাকা ফিরিয়ে বলল, দোয়া করি খোকা, বড় হও। তোমার ঋণ শোধ হয়ে গেল। সেদিন থেকে রেজা মাঠে যাবার সময় বাঁশী বাজায়। একদিন হেডমাস্টার ডাকল। রেজা, এস, তোমার ডাংগুলি দিয়ে ঘন্টা দাও। রেজা গুলি বের করে ছুঁড়তে লাগল। এক, দুই, তিন.....পরপর দশ বার ঘন্টা বাজলো। একবারও ভুল হল না। ছাত্ররা অবাক হয়ে লাইন করে দাঁড়াল। স্যার বলল, আজ রেজা জাতীয় সঙ্গীত বাজাবে। লাইনে দাড়িয়ে তিনশ ছেলেমেয়ে কান খাড়া করে শুনতে লাগল। যখন গান শেষ হয়ে গেল তখন তারা হাততালি দিয়ে আকাশ ফাটিয়ে দিল।



২৫৪। আমার বন্ধু হও



আলম সাহেব প্রাইমারী স্কুলের পিয়ন। এতিমখানার সামনে দিয়ে রোজ প্রাইমারী স্কুলে যায়। হঠাৎ এক দিন এতিমখানার বেড়ার ফাঁক দিয়ে একটা ছোট হাত বের হল। তাকে একটা খাম দিয়ে দশ বছরের একটি মেয়ে বলল, দাদু এই নাও। আলম সাহেব যেতে যেতে চিঠিটা পড়ল। "কেউ আমাকে ভালবাসে না, তুমি আমার বন্ধু হও - চম্পা।" তার চোখ পানিতে ভরে গেল। স্কুলের পরে এতিমখানায় গিয়ে দারোয়ানকে বলল, চম্পার সঙ্গে দেখা করব। সে আমার নাতনী হয়। দারোয়ান চম্পাকে ডেকে পাঠাল। আলম সাহেব বলল,



• চম্পা, নাও, এই চকলেট খাও, সত্যি কি ওরা তোমাকে ভালবাসে না?



• ওরা শুধু ভাত কাপড় দেয়, বই দেয়, কিন্তু হাসে না। কেউ হাসে না, কোন দিন হাসে না।

• আমি যখন এই পথ দিয়ে যাই, তুমি বেড়ার কাছে এস।

এখন চম্পা রোজ তিনটার সময়ে বেড়ার পাশে দাড়ায়। দাদু হাসে, একটা চকলেট দেয়, আবার হাসে আর চলে যায়। এক দিন চম্পা বলল,

- দাদু আমি চকলেট খাব না, তুমি খাও।
- তাহলে তোমার জন্য আমি কি করব?
- কালকে ছুটি, আমাকে বাড়িতে নিয়ে যেও।

পরের দিন দাদা-দাদী এল। দাদু তার ডান হাত ধরল, দাদী তার বাম হাত ধরল। হাসতে হাসতে বাড়িতে নিয়ে গেল। দাদী পিঠা খেতে দিল। চম্পা সারা দিন বক বক করল, দাদুর সঙ্গে খেলা করল, দাদীর কোলে ঘুমাল। বিকালে চলে যাবার সময় কেঁদে ফেলল।

- আমি যাব না দাদু, আমি এখানে থাকব।
- কে তোমাকে খেতে দেবে? কে মানুষ করবে?
- কেন, তুমি আমাকে খেতে দেবে, তুমি মানুষ করবে!
- আমরা গরীব মানুষ, প্রতিদিন ভাল খাবার দিতে পারব না দাদু।



- আমি ভাল খাবার চাই না।
- আমাদের টাকা নেই, আমরা সুন্দর কাপড় দিতে পারব না দাদু।
- আমি ভাল কাপড় চাই না।
- তাহলে কি চাও?
- তোমরা প্রতিদিন হাসবে। আমি আর কিছু চাই না।
- কিন্তু.....

চম্পা কোন কথা শুনল না। দাদা-দাদীর কাছে থেকে গেল।

২৫৫। দৈত্যের কাছে শুকতারা।

এক বড় ব্যবসায়ী ছিল। তার এক সুন্দরী মেয়ে ছিল। নাম শুকতারা। সে বাবাকে খুব ভালবাসত। একদিন বাবা খবর পেল যে, তার একটা জাহাজ বন্দরে এসে গেছে, তাই সেদিকে রওনা হল। মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল,

– তোমার জন্য কি আনব ?

– শুকতারা হেসে বলল, একটি গোলাপ।

ফিরে আসার পথে বাবা এক বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলল। রাত হয়ে যাচ্ছিল, সে খিদে ও ভয়ে মরে যাচ্ছিল। হঠাৎ এক সুন্দর প্রাসাদ দেখতে পেল। ভিতরে কেউ নেই, তবুও অতিথীর জন্য খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করা আছে। সে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে উঠে সে চলে যাচ্ছিল, এমন সময় বাগানে একটা সুন্দর গোলাপ দেখতে পেল। তখন তার মনে পড়ল মেয়েটার কথা এবং গোলাপটি তুলে নিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ানক সুর শুনতে পেল,

– থাম! এই গোলাপের মত মূল্যবান আমার কিছু ছিল না, তুমি এটা মেরে ফেলেছো। তোমাকেও মরতে হবে।

তার মত কুৎসিত ও ভয়ানক মানুষ সে জীবনেও দেখেনি। তার পায়ে পড়ে বলল, হুজুর, আমার একটা মেয়ে আছে, এই ফুলের চেয়েও সুন্দরী। সে আমার কাছে শুধু এই গোলাপ চেয়েছে। মরার আগে এই গোলাপ তার কাছে দিয়ে আসব।



– আচছা, সে যদি আমার প্রাসাদে থাকতে রাজি হয় তবে তুমি প্রাণে বেঁচে যাবে। যাও, তোমাকে তিন দিন সময় দিলাম।

বাড়ি গিয়ে বাবা মেয়েকে তার গোলাপ দিয়ে কাহিনীটা শুনাল।

শুকতারা বলল, বাবা, আমি তার কাছে গিয়ে থাকব। যদি প্রাণ যায় তবুও দুঃখ নেই। বাবা কাঁদতে কাঁদতে তাকে দিয়ে আসল।

রাতে দৈত্য শুকতারার সামনে খেতে বসল। শুকতারা এত ভয় পেল যে, একটা ভাতও মুখে নিতে পারল না। কিন্তু পরের দিন দৈত্য বলল, এই প্রাসাদের ভিতরে যা আছে, সবই তোমার।

অনেক দিন কেটে গেল। দৈত্যের প্রতি তার বন্ধুত্ব দিন দিন বাড়তে লাগল। একদিন শুকতারা খবর পেল, বাবার অসুখ হয়েছে। দৈত্যকে বলল, আমার যেতে হবে। দৈত্য বলল, তুমি যদি সাত দিনের মধ্যে না ফের আমি মরে যাব।

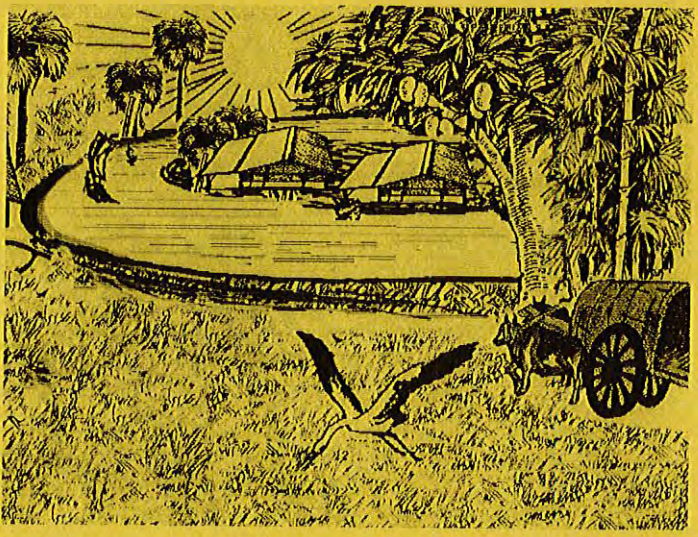


শুকতারা বাবার সেবা করতে গেল। কয় দিন গেল তার হিসাব রাখল না। একদিন দৈত্যের সাদা ঘোড়াটি এসে হাজির হল। তার গলায় একটা চিঠিঃ-" আমার প্রাসাদ তোমার থাকল, আমি মরে যাচ্ছি"। শুকতারা সঙ্গে সঙ্গে ফিরে গেল। দৈত্য অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। তার দু'চোখ খুব সুন্দর ও মায়াভরা। শুকতারা কেঁদে ফেলল। তার চোখের পানি পড়ল দৈত্যের মুখের উপর...। হঠাৎ সেই মুখ পাল্টে গেল, ধীরে ধীরে এক সুন্দর যুবকে পরিনত হল। সে উঠে বলল, এক দুষ্ট যাদুকর আমাকে একটা বান মেরেছিল। তোমার চোখের পানিতে যাদু কেটে গেছে। এবার আমাদের সুখের জীবন শুরু হবে।



২৫৬। কে বড় শিল্প

বাগদাদ শহরে তিনজন বড় শিল্পী ছিল। তারা বছরের পর বছর খলিফার পুরষ্কার পাবার জন্য ছবি আঁকত, তবে তিনজনের মধ্যে কে ভাল তা কেউ বিচার করতে পারত না, তাই পুরস্কার তিনজনের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হত। এই বছরেও তারা একটা করে ছবি খলিফার কাছে নিয়ে আসল। কোনটা সবচেয়ে সুন্দর তা বিচার করার জন্য মন্ত্রীদের নিয়ে খলিফা বের হল। সকলের আনন্দের জন্য ছবি তিনটে টাঙ্গানো হয়েছিল খলিফার প্রাসাদের সামনে। শত শত মানুষ প্রাসাদের সামনে দাড়িয়ে দেখছিল। মন্ত্রীরা খলিফাকে বলল, আল্লাহের পৃথিবীর মত সুন্দর কোন শিল্প নেই, সুতরাং যে ছবি বাস্তবের সঙ্গে বেশী মিলে যাবে সেটা বেছে নেবেন। প্রথম শিল্পীর ছবিটা দেখে খলিফা অবাক হয়ে গেল। দৃশ্যটা ছিল একটা চাষীর ঘর ও তার চারিদিকের মাঠ। মাঠের ঘাস এত জীবন্ত দেখাচ্ছিল যে গরু ও ছাগল, ভুল করে ঘাস খেতে আসত। দ্বিতীয় শিল্পী এঁকেছিল একটা ফুলের বাগান। ফুলগুলো এত সুন্দর ও সত্য দেখাচ্ছিল যে মৌমাছি ও প্রজাপতিরা রস খেতে





আসছিল। খলিফার চোখ দুটি আনন্দে ছল ছল করছিল। মন্ত্রীকে বলল, এমন শিল্প জীবনেও দেখিনি। এ অবশ্যই পুরষ্কার পাবে। মন্ত্রী বলল, হুজুর একটু ধৈর্য ধরুন, আর একটা ছবি আছে, ঐটা না দেখে পুরষ্কার দিতে পারবেন না। ছবিটা ছিল বিরাট আর সত্যি দেখার মত। তবে ছবিটার সামনে শিল্পী নিজে দাড়িয়ে থাকতে দেখে খলিফা বিরক্ত হল। মন্ত্রীকে বলল,

- পলাশ শিল্পিকে সরে যেতে বল।

- পলাশ আমার কথা শুনবে না। আপনার কথাও না শুনতে পারে।

- কি? আমার কথা শুনবে না? এই পলাশ! সরে যা ওখান থেকে! সরে যা বলছি! পলাশ যেখানে ছিল সেখানে দাড়িয়ে রইল। তার দুটি চোখ খলিফার মুখের দিকে। খলিফা রাগে জ্বলছিল। প্রহরীদের বলল, ঐ লোকটাকে ধরে আমার কাছে নিয়ে এস তো! প্রহরীরা গেল কিন্তু পলাশকে ধরে আনতে পারল না। সেখানে শিল্পী ছিল না। ছিল শুধু তার ছবি। ছবিটা এত জীবন্ত দেখাচ্ছিল যে খলিফা নিজে ভূল করেছিল। এদিকে শিল্পী ভিড়ের মধ্যে ছিল ও মজা দেখছিল।



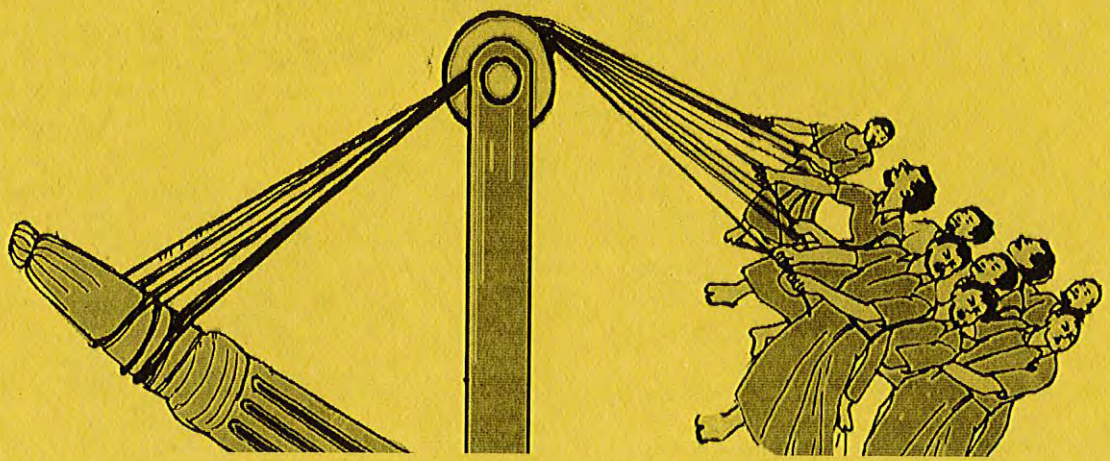
খলিফা এবার হেসে বলল, অন্য কেউ যদি আমাকে নিয়ে এমন খেলা করত তার মাথা যেত, কিন্তু পলাশ এর জন্য পুরষ্কার পাবে! সে শুধু পশুপাখিদের ভুলায় না... আমাকেও ভুলাতে পারে।

২৫৭। দড়িতে পানি

এক রাজা ছিল, তার যত জ্ঞান তত রাগও ছিল। একদিন তার রাজধানীর ময়দানে মস্ত বড় পাথরের স্তম্ভ বসানোর ব্যবস্থা করল। স্তম্ভটা মিশর দেশ থেকে জাহাজে করে আনা হয়েছিল। সেটা দাড় করাবার জন্য মিস্ত্রীরা মোটা মোটা দড়ি তৈরী করেছিল। স্তম্ভটি দাড় করাবার সময় এল। ময়দান মানুষে ভরে গেল। চারিদিক থেকে সবাই পরামর্শ দিচ্ছিল। ময়দানে এত শব্দ হচ্ছিল যে মিস্ত্রীরা পরস্পরের কথা শুনতে পাচ্ছিল না। শেষে রাজা নিজে এসে হুকুম দিল, কাজের সময় যদি কেউ কথা বলে তার মাথা কাটা হবে।

আস্তে আস্তে স্তম্ভের মাথা আকাশের দিকে উঠতে লাগল। সবাই হা করে তাকায় ও খোদার কাছে মোনাজাত করে । রাজার মুখ দেখে সবাই ভয়ে কাঠ হয়ে রয়েছে।

এবার স্তম্ভের ভার পুরোপুরি দড়ির উপরে পড়েছে। তখন হঠাৎ সবাই দেখতে পেল দড়িগুলো ঢিলা হয়ে যাচ্ছে, গরম হয়ে যাচ্ছে, এমন কি যায়গায় যায়গায় ধোয়া উঠে যাচ্ছে। জনতার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল... এবার সর্বনাশ হবে, ঐ আশ্চর্য যাদু পড়ে ভেঙ্গে যাবে... জনতার মধ্যে





এক বৃদ্ধ নাবিক ছিল। জাহাজে পাল উঠাতে নামাতে তার সারা জীবন কেটে গিয়েছিল , দড়ির স্বভাব সে ভাল করে জানত। ময়দানে দুটো ঝর্ণা ছিল । বৃদ্ধ নাবিক হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, পানি! পানি! দড়িতে পানি দাও! বলে নিজের টুপি খুলে পানি এনে দড়িগুলোর উপরে ছিটিয়ে দিতে লাগল। তার দেখাদেখিতে যাদের টুপি ছিল তারা সবাই পানি তুলে ছিটিয়ে দিতে লাগল। দড়ি আবার শক্ত হয়ে গেল, স্তম্ভটি আস্তে আস্তে উঠতে লাগল। যখন সোজা হয়ে দাড়াল তখন সমস্ত জনতা একটা বজ্রের মত জয়উল্লাস করে উঠল। কিনতু হঠাৎ জনতার চিৎকার থেমে গেল। চারজন সেপাই এসে বৃদ্ধ নাবিককে ধরে রাজার কাছে নিয়ে গেল।

রাজা গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করল, তুমি আমার হুকুম শুনতে পাও নি?

- পেয়েছি মহারাজ।
- কোন সাহসে তা অমান্য করেছ?
- কই, আমি তা অমান্য করিনি মহারাজ! আপনি চেয়েছিলেন এই স্ত ম্ভ দাড় করাতে, তাই না? সেটা দাড় করাবার জন্য তো আমি চিৎকার করেছি... তা ছাড়া আমি ভাবলাম, এত সুন্দর স্তম্ভ যদি পড়ে ভেঙ্গে যায়, তাহলে আমার মাথা রেখে কি লাভ? আর যদি স্তম্ভটা দাড় করিয়ে দিতে পারি, তাহলে আমার মাথা কেটে রাজার কি লাভ? রাজাদেরও বুদ্ধি আছে। রাজা হাসল, তারপর নিজের আঙ্গুলের আংটিটা খুলে বলল, বুদ্ধি আছে বলে বেঁচে গেলে। এই নাও, যদি কোন দিন বিপদে পড় আমার কাছে এস। এই আংটিটা দেখলে সবাই পথ ছেড়ে দেবে।

২৫৮। পোড়া ঘায়ের দাগ

দুলুর বয়স আট বছর । একদিস গোসল করতে গিয়ে দেখে, বুবুর দু' হাতে পোড়া ঘায়ের দাগ। দেখতে বিশ্রী লাগে। বুবুকে সে ভালবাসে, তাই কিছু বলল না। তারপরে সে ব্যপারটা ভুলে গিয়েছে। বুবু তো সব সময় দু হাত ঢেকে রাখে।

একদিন কিনতু বুবুর উপরে সে ভীষন রাগ করল। আজ তার বই পড়ার ইচ্ছা নেই, বুবু তাকে জোর করে পড়াতে চাচ্ছে। বুবুকে মারতে ইচ্ছা হয়, আর কি! অনেক্ষণ ঝগড়া হতে লাগল। আব্বা শুনে কিছু বলে না, দুই ভাইবোনের ঝগড়া এমনি মিটে যায়। এবার কিনতু দুলু ছাড়ে না।



বুবুকে আঘাত করার জন্য মনে মনে কিছু খোজে। শেষে ঐ কথা তার মনে পড়ে গেল। বলল, তুই চুপ কর্, তুই বিশ্রী, তোর দু'হাতে পোড়া ঘায়ের দাগ! হঠাৎ ঝগড়া থেমে গেল। বুবুর চোখে পানি এল। বাবা তার দা ছেড়ে দিয়ে তাকে মারতে এল। মাও রান্নাঘর থেকে বের হল। দুলু অবাক! কিছু বুঝতে পারছে না! বাবার চোখে এত রাগ সে কখনও দেখেনি! মাও তার উপরে এত অসন্তুষ্ট কোন দিন হয়নি। কি এমন করেছে সে?... বাবা তাকে মারতে যাচ্ছিল। মা বলল, থাম, সে জানে না। তারপরে দুলুর হাত ধরে তাকে রান্নাঘরে নিয়ে গেল। বলল, বস, কথা আছে। মায়ের মুখ খুব গম্ভীর, তার চোখ ছল ছল করছে। মা আস্তে আস্তে বলতে লাগল, তোমার বয়স তখন দু' বছর ছিল। একদিন সন্ধ্যায় হ্যারিকেন জ্বালাচ্ছিলাম, তুমি বসে বসে চোখ মোটা

করে দেখছিলে। তখন তোমার বুবু এসে বলল, আম্মা, একটা মোরগ কম পড়ছে, আমি খুঁজে পাচ্ছি না। তোমার বুবুর সে সময় দশ বছর বয়স, ক্লাস ফোরে পড়ত। অন্ধকার হয়ে আসছিল। আমি বললাম, ভাইয়াকে একটুখানি সামলাও, আমি নীলুদের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। আমি চলে গেলে তুমি না কি উঠানে মোরগটা দেখতে পেলে। সঙ্গে সঙ্গে বুবু নেমে গিয়ে খোয়াড়টা খুলে দিল। হঠাৎ তোমার আর্ত চিৎকার শুনতে পেল। রান্নাঘরের মধ্যে আগুন দেখল। তখন বিদ্যুৎবেগে দৌড়াল। তোমার গায়ের কাপড় কেরোসিন লেগে জ্বলছিল একটা মশালের মত...



মা আর কথা বলতে পারছিল না। দুলু জিজ্ঞেস করল, তারপর?... মা নিজেকে সামলে নিল। বলল, দেখতে পাচ্ছ, পুকুর এখান থেকে কত দুর? বুবু খালি হাতে তোমাকে তুলে ধরল, তারপর দৌড়ে গিয়ে পুকুরে ঝাপ দিল... সেইজন্য তুমি এখনও বেঁচে আছ। দুলু অনেক্ষন চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে রান্নাঘর থেকে বের হল। বুবুর সামনে এসে কিছু বলতে পারল না। হঠাৎ তার গলা জড়িয়ে ধরল ও তার দু' চোখ দিয়ে পানি ফেলতে লাগল।



২৫৯। ভিক্ষা ও কাজ



মহানবী যুদ্ধের পরে মদিনার দিকে ফিরছিলেন। তার সঙ্গে দশজন মুজাহিদ। তারা তাঁবু গেড়ে রান্না করছিল। মহানবী কাঠ কুড়াতে গিয়েছেন। একজন ভিক্ষুক তাঁবুর কাছে এল। চারদিকে মহানবীকে খুঁজল। তিনি কাঠের বোঝা নিয়ে আসছিলেন। ভিক্ষুক বলল, নবীজী, আপনার এই কাজ করা সাজে না। ওদের করতে বলুন। মহানবী বললেন, কেন? কোন কাজে আমার লজ্জা নেই, যেকোন কাজে আমার সম্মান বাড়ে। তুমি কি কর?

- আমি হুজুর... ভিক্ষা করতে এলাম। কোন কাজ করি না।
- তা কি করে হয়? কাজ না করা তো পাপ!
- ডাকাত এসে আমার সব টাকা-পয়সা, কাপড়-চোপড় লুট করে নিয়ে গেছে। তারপর থেকে আমি ভিক্ষা করে খাই। আমি বড় পাপী হুজুর, কোন পাপ করতে আমার বাকি নেই। মিথ্যা, ছল-চাতুরী, চুরি, আমি সব করি। বাঁচার জন্য আর কোন পথ পাচ্ছি না।
- আমি পথ করে দিচ্ছি, তবে পাপ ছেড়ে দিতে হবে, রাজী আছ?
- বাঁচতে পারলে আমি রাজী আছি!

তাহলে শোন, সমস্ত পাপের গোড়া হল মিথ্যা কথা। গোড়াটা কাটলে অন্যান্য পাপ হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। মিথ্যা বলা ছেড়ে দাও।

- হুজুর, আপনি জানেন না! আমি এত দুঃখের কথা শুনাই, তবু ভিক্ষা

পাই না, আর এ সব মিথ্যা না বললে ওরা কিছু দেবে না, তখন না খেয়ে মরতে হবে হুজুর!

• আচ্ছা, তোমার বাড়িতে কি কি জিনিস আছে?

• আর কিছু নেই হুজুর। আপনি নিজে দেখে আসুন।

নবীজী কাঠের বোঝা নামিয়ে ভিক্ষুকের বাড়িতে গেলেন। সত্যি, তার ঘরে কিছু নেই। শুধু এক কোনায় একটা ভাঙ্গা কুড়াল দেখতে পেলেন। ডাকাতেরা তা ফেলে রেখেছিল। নবীজী সেটা নিয়ে বললেন, চল। তাঁবুতে ফিরে এসে তিনি নিজের হাতে কুড়ালে একটা নতুন হাতল লাগিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, এই নাও, বনে গিয়ে কাঠ কেটে বাজারে বিক্রী কর। তার আগে এই কয়টা টাকা নিয়ে কিছু খেয়ে নাও। এক সময় ফিরিয়ে দেবে।

লোকটি চলে গেল।



এক মাস পরে মহানবীর কাছে এল এক ভদ্রলোক। তার পোষাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

• হুজুর, আপনার টাকা ফিরিয়ে দিতে এলাম।

• এখন তোমার অবস্থা কেমন?

• ভাল, আমার অভাব কেটে গেছে, আর সবাই আমাকে সৎ মানুষ বলে সম্মান করে।

• এখনও কি ভিক্ষা করে বেড়াও?

• না হুজুর, ভিক্ষাও করি না, মিথ্যাও বলি না। বরং ভিক্ষুক দেখলে আমার লজ্জা হয়। তাদেরকে আমার পরিবর্তনের কথা বলি।

• বেশ , দোয়া করি, জীবনে আরও উন্নতি কর।

২৬০। দাউদ ও গলিয়াৎ

তিন হাজার বছর আগের কথা। এক সময় হিব্রু ও ইমোরীয় জাতির মধ্যে এক মারাত্মক যুদ্ধ বেধে গেল। জর্দান নদীর পাশে একটা দেশ আছে, হিব্রুদের দেশ। হিব্রুরা কিন্তু দু'শো বছর আগে মিশর দেশে চলে গিয়েছিল, তারপর একদিন সেখান থেকে ফিরে এসে বলল, এটা আমাদের দেশ, ফিরিয়ে দাও। ইমোরীয়রা বলল, আমরা এখানে জন্মেছি, আমরা ছাড়ব কেন? মারাত্মক যুদ্ধ বেধে গেল।

হিব্রুদের সেনাদল একটা পাহাড়ের গায়ে শিবির গেড়ে বসেছিল। তাদের আক্রমণ করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু ইমোরীয়দের সেনাদল তাদের চেয়ে শক্তিশালী। ছোটবেলা থেকে তাদের যুদ্ধ করার অভ্যাস।

একদিন দাউদ নামে এক যুবক হিব্রুদের সেনাদল দেখতে এল। তার দুটি ভাই সেনাদলে যোগ দিয়েছিল। সে তাদের জন্য কিছু খাবার আনল। দুই ভাই খেয়ে দেয়ে বলল, এবার বাড়ি যাও, নইলে আমাদের মেষ চরাবে কে ?

দাউদ বাড়ি যাবার আগে পাহাড়ের উপর থেকে শত্রু দলের দিকে চেয়ে দেখল। ঠিক সেই সময় সেখান থেকে বের হল সাত ফুট লম্বা এক মহাবীর, তার ঢাল ও তলোয়ার বিরাট, তার স্বর বজ্রের মত। সে বলতে লাগল, তোমরা খরগোসের জাত! তোমাদের একজন আমার সঙ্গে লড়াই করতে এস। যার জয় হবে সে এই দেশ পেয়ে যাবে।

দাউদ জিজ্ঞেস করল, কতদিন থেকে এইভাবে বড়াই করছে সে ?

তার ভাইয়েরা বলল, চল্লিশ দিন।



দাউদ রাগে ফেটে পড়ছিল। শেষে আর সহ্য করতে পারল না। রাজার শিবিরে গিয়ে বলল,

মহারাজ, ঐ বাচাল আমাদের অপমান করতে থাকবে আর আমরা সবাই বসে থাকব ? আমি ওর মাথা কেটে নিয়ে আসি। রাজা তার মুখের দিকে তাকাল। দাউদের মুখে এখনো গোফ দাড়ি ওঠেনি। রাজা বলল, ওর সঙ্গে তুমি পারবে না। তুমি মরতে যাচ্ছ।

- এত অপমান সহ্য করার চেয়ে মরাই ভাল।

- যদি একান্তই যেতে চাও, আল্লাহ তোমার সহায় থাকুন। এই নাও আমার ঢাল ও তলোয়ার।

- ওতে আমার অভ্যেস নেই, আমার অস্ত্র দিয়ে লড়াই করব।

দাউদের কোমরে বাঁধা ছিল রাখালের ফিঙ্গা। সে পথে দু'টি পাথর কুড়িয়ে নিল, তারপর সোজা গলিয়াতের দিকে হাটল।

গলিয়াৎ এই কিশোরকে আসতে দেখে বলল, ওরা মরার জন্য আর কাউকে পাঠাতে পারল না ? মায়ের ছেলে মায়ের কোলে ফিরে যা। দাউদ বলল, তুমি নিজের দাম বাড়াবার জন্য আমাদের সঙ্গে লড়তে এসেছ আমি নিজের ভাইবোনদের বাঁচাবার জন্য লড়ব। এস, তোমার শেষ দিন এসে গেছে।





গলিয়াৎ তলোয়ার বের করার সময়ও পেল না। বিদ্যুৎ বেগে একটা পাথর দাউদের ফিঙ্গা থেকে এসে তার কপালে ঢুকে পড়ল। গলিয়াৎ চিৎ হয়ে পড়ে গেল। আর উঠল না। ইমোরীয়দের সেনাদল তাদের মহাবীরের দশা দেখে ভয়ে পালাতে শুরু করল। হিব্রুরা তাদের ধাওয়া করে ছিন্নভিন্ন করে দিল।

২৬১। বেতের ঘা

খালেক মিয়া আমাদের জমি সস্তায় কিনে নিয়েছে। তিনশ টাকা পেত, আমরা দিতে পারিনি বলে জমিটা রেজিষ্ট্রী করে নিল। সেদিন আমি কাঁদিনি, আমার বয়স বার বছর মাত্র, কিন্তু বাবা কেঁদেছে। এখন আমাদের ভিটা ওর নামে রেজিষ্ট্রী হয়ে গেছে, যখন তখন আমাদের তাড়িয়ে দিতে পারে। ওকে দেখলে আমার গা শিউরে ওঠে।



এক দুপুরে আমি পুকুরে সাঁতার কাটছি, এমন সময় খালেক মিয়া পাশের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। আমি আর থাকতে পারিনি। পানির তলে হাত দিয়ে যত কালো কাদা তুলতে পারলাম সব তার সাদা জামার দিকে ছুড়ে ফেলে দিলাম, তারপর সাঁতার কেটে ওপারে উঠে গেলাম। খালেক মিয়া আকাশ ফাটিয়ে গর্জন করে উঠল। আমি ওপারে বসে বসে মজা দেখতে লাগলাম। বাবাকে ডেকে, লোক ডেকে, সে আধা ঘন্টা মাথা ঝাকিয়ে, হাত নেড়ে, পা নেড়ে, সুর

বাড়িয়ে নালিশ করতে লাগল। শেষে যখন দেখলাম পুকুর পার দিয়ে বাবা আমাকে ধরতে আসছে, তখন আখের খেতে পালিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলাম। সারাদিন সেখানে লুকিয়ে কাটালাম। কিন্তু রাত্রে ক্ষুধার জ্বালায় বাড়ি ফিরতে হল। মা খেতে দিয়ে আধা ঘন্টা আমাকে লুকিয়ে রাখল। কিন্তু শেষে বাবা আমাকে খুঁজে পেল।

উঠানে তখনও অনেক লোক ছিল। তারা আমার দুষ্টুমির কথা আলোচনা করছিল। বাবা আমাকে ধরে নিয়ে গেল ঘরের মধ্যে, তারপরে বেত দিয়ে মারতে শুরু করল... এক ঘা, দুই ঘা, তিন ঘা... দশ ঘা... আমি ভয়ে মরে যাচ্ছিলাম, চিৎকার করে আকাশ ফাটিয়ে দিচ্ছিলাম, বাইরের লোকেরা বাবাকে বাধা দিতে শুরু করল, কিন্তু বাবা বিশ পর্যন্ত না মেরে বেত ছাড়ল না। তারপর বাইরে গেল। সবাই তাকে তিরস্কার করে বলতে লাগল, ছেলেকে মেরে ফেললে যে! ইত্যাদি, ইত্যাদি...



আসলে তাদের ভাবনা করা ভুল। বাবা যখন বেত মারছিল তখন কেন এত জোরে শব্দ হচ্ছিল তারা বোঝেনি... বেত একবারও আমার গায়ে পড়েনি, পড়েছিল বিছানার উপরে।